শাহরিয়ার কবির

পাথারিয়ার খনি-রহস্য

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

পাথারিয়ার খনি-রহস্য

শাহরিয়ার কবির

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা

অনন্তকে
যার ভেতর হাবিব
বেঁচে থাকবে

ছোটদের জন্য লেখকের অন্যান্য বই

নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়
হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার
একাত্তরের যীশু
সীমান্তে সংঘাত
নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা
হানাবাড়ির রহস্য
মিছিলের একজন
পুবের সূর্য

লেখকের কথা

ছোট্ট বন্ধুরা

এক যুগ আগে বেরিয়েছিলো নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়। তখন বলেছিলাম—আবির, বাবু, ললি, টুনিদের নিয়ে আরো লেখার ইচ্ছে আছে। সেই থেকে নুলিয়াছড়ির পাঠকরা আমার পেছনে লেগেছে, পরেরটা কবে বেরুবে। বারো বছরের বেশি সময় লাগলো আবিরদের নিয়ে আরেকটি বই লিখতে। এ সময়ে যদিও ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি বই লিখেছি, তবু নুলিয়াছড়ির পাঠকেরা এক যুগ আগের প্রতিশ্রুতি আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। তাড়া দিয়েছে প্রতীকের বাবাও।

'পাথরিয়া . . . . . ' কাহিনীর ছক বহু আগেই করে রেখেছিলাম। আমার এক বন্ধু ছিলো ভূতত্ত্ব বিভাগে পড়তো।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলো, পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে গেলো। আমার সেই বন্ধুটির কাছে প্রথম শুনি পাথারিয়ার কথা। ম্যাপ চুরির ঘটনাও বলেছিলো সে। পরে পাথারিয়া গিয়ে নিজ কানে শুনে এসেছি 'পাহাড়ের হৃৎকম্পন'। তখনই ঠিক করেছিলাম আবিরদের পাথারিয়া আনতে হবে।

আমার বন্ধু আশীষ সিলেটের আঞ্চলিক সংলাপগুলো লিখতে সাহায্য করেছে। পাথারিয়া সম্পর্কে আরো তথ্য দিয়েছে আমার বন্ধু মশগুল। পাথারিয়া যখন লেখা শুরু করি আমার প্রিয় বন্ধু কাজী হাসান হাবিব তখন মৃত্যুশয্যায়। ওর ক্যান্সার হওয়ার খবর পেয়ে লেখার সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। অথচ হাবিব প্রায় প্রতিদিনই তাড়া দিয়েছে লেখা কদ্দুর এগুলো, বইমেলায় বের করতেই হবে। হাবিবের কথা আমি রেখেছি কিন্তু হাবিব আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এ বই সম্পর্কে তোমাদের বলতে গিয়ে হাবিবের কথাই বেশি মনে পড়ছে।

১২-২-৮৯ শা.ক.

জলপাই সবুজ চিঠিতে বিপদের সংকেত

নবেম্বরের ঠিক মাঝামাঝি আমাদের স্কুলের বছর শেষের পরীক্ষাটি হয়ে গেলো। বড়দিনের লম্বা দেড় মাস ছুটি কিভাবে কাটাবো ভাবছি—এমন সময় মিসৌরি থেকে বাবু অবাক-করা এক চিঠি লিখলো। বাবু আমার মেজো কাকার একমাত্র ছেলে, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের একজন। ছ' মাস আগে ও ছিলো একমাত্র বন্ধু। এখন আমার আরো বন্ধু আছে, তবু বাবুর কথা আলাদা। মেজো কাকা ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ এ্যাম্বেসির কাউন্সিলার। বাবু মিসৌরির এক বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করে। মাসে কম করে হলেও দুটো চিঠি লেখে আমাকে। গত মাসে অবশ্য একটা চিঠি লিখেছে। এ নিয়ে আমি কিছু মনে করি নি। তার আগের মাসে আমিও ওকে একটা চিঠিই লিখেছিলাম।

বাবু ওর চিঠিতে লিখেছে, মেজো কাকাকে নাকি জাপানে বদলি করা হয়েছে। আর জাপান যাওয়ার আগে দু' মাস তিনি দেশে কাটাতে চান। বাবুদের এবার বড়দিনের ছুটি ডিসেম্বরের আগেই শুরু হবে। গত চিঠি লেখার সময়ে ও ভাবতেই পারে নি এবারের বড়দিনের ছুটি দেশে কাটাবে। ভাববে কি করে, চার মাস আগেই তো ও গরমের ছুটি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলো। সেবার নেলী খালার নুলিয়াছড়ির রহস্যময় বাড়িতে কি মজার সময়ই না কেটেছিলো! ভাবলে এখনো রোমাঞ্চ হয়। বাবু ওর চিঠিতেও সে সব কথা লিখেছে। গত চার মাসে ও যে কটা চিঠি লিখেছে, সবগুলোতে নুলিয়াছড়ির কোনো না কোনো ঘটনার কথা থাকবেই। এবারের চিঠি ও শেষ করেছে এভাবে—

নেলী খালার সঙ্গে জাহেদ মামার বিয়ে তো ডিসেম্বরেই হওয়ার কথা। বাবাকে যাঁরা বদলি করেছেন, কি বলে যে তাঁদের ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাই না। যদিও এই বদলিটা বাবার পছন্দ হয় নি। তুমি, ললি আর টুনি আমাকে ফেলে নেলী খালার বিয়েতে মজা করছো—যতোবার কথাটা ভেবেছি ততোবার পৃথিবীটা অসার মনে হয়েছে। টুনির সঙ্গে চিঠিতে এ নিয়ে কয়েক দফা ঝগড়াও হয়ে

গেছে। ওর ধারণা আমেরিকায় আমি খুব আনন্দে আছি। আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো আবির, এখানে আমার কি রকম বিচ্ছিরি সময় কাটে! টুনি এ কথা বুঝতেই চায় না। ওর সঙ্গে বড় রকমের একটা ঝগড়া আছে--আপাতত তুলে রেখেছি। তোমাদের সঙ্গে আবার এভাবে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। চিঠির উত্তর দেয়ার দরকার নেই। আমরা দিন দশেকের মধ্যে আমেরিকা ছাড়ছি। আমি পরশু ওয়াশিংটন চলে যাচ্ছি। মিসৌরিতে বোধ হয় আর ফেরা হবে না। এ নিয়ে দুঃখও করি না। হতচ্ছাড়া এই জায়গাটা কখনো আমার ভালো লাগে নি। যদিও আমার রুমমেট ল্যারি একটু আগে দুঃখ দুঃখ মুখে বলছিলো, আমাকে নাকি ও মিস করবে। ভালো করে জানি জেনি সঙ্গে থাকলে পৃথিবীর কারো কথা ওর মনে থাকে না। বলতে হয় তাই বলা, আমিও বলেছি। অনেক কথা জমে আছে। দেখা হলে সব বলবো। ভালোবাসা জেনো। ইতি—বাবু।

চার পাতার চিঠিটা কয়েক বার পড়ে মেজো কাকার খবরটা মাকে দেয়ার জন্য আমার চিলেকোঠার ঘর থেকে এক ছুটে দোতালার শোয়ার ঘরে এসে দেখি জলপাই রঙের এক-খানা চিঠি হাতে মা উদাস হয়ে খাটের ওপর বসে আছেন। নেলী খালাকে দেখেছি মাকে জলপাই রঙের রেডিও বণ্ড কাগজে চিঠি লিখতে। ওতে আবার জুঁই ফুলের গন্ধ থাকে। মাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, নিশ্চয়ই নেলী খালা কোনো 'উদভুট্টি কাণ্ড' ঘটিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে নেলী খালা বিদেশে ছিলেন। বহু বছর পর দেশে ফিরে নতুন যা কিছু করতে যান মা বলেন, 'উদভুট্টি কাণ্ড'—যা নাকি কেউ কখনো দেখে নি। নেলী খালা কখন কি 'উদভুট্টি কাণ্ড' ঘটান এই ভেবে মা সারাক্ষণ শঙ্কিত থাকেন। আর তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখলেই পাতার পর পাতা চিঠি লিখে 'ইহা কদাচ করিও না' কিম্বা 'অবশ্যই আমার কথা মানিয়া চলিবে, মামার সহিত পরামর্শ মোতাবেক কাজ করিবে'—ধরনের গম্ভীর সব উপদেশ দেবেন।

মাকে উদাস, গম্ভীর, শঙ্কিত, বিরক্ত মুখে জলপাই রঙের চিঠি হাতে বসে থাকতে দেখে মনে হলো নেলী খালার এবারের 'উদভুট্টি কাণ্ড' নিশ্চয় গুরুতর কিছু হবে। আমি যে ঘরে ঢুকেছি মা ফিরেও তাকালেন না। নেলী খালার চিঠিতে কি লেখা আছে দেখার জন্য মনটা আঁকুপাকু করছিলো। কথাটা মাকে কিভাবে বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। জানি, ভূমিকা ছাড়া বলতে গেলেই মার ধমক খেতে হবে। ঠিক এই সময় বাবা এসে আমাকে রেহাই দিলেন।

কলেজ ফেরত বাবা প্রথমে ইজি চেয়ারে বসে জুতো-মুজো খুললেন। আলনার পাশে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় বদলালেন, বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে তোয়ালে হাতে বেরুলেন, মার কোনোদিকে নজর নেই। খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানার ওপর বসে মাকে বললেন, 'অতো গম্ভীর হয়ে কি ভাবছো শানু? নেলী আবার কোনো অঘটন ঘটিয়েছে নাকি!'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবার দিকে তাকালেন। আমাকে যেন দেখতেই পান নি—'তুমি তো ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছো। মেয়েমানুষ হয়ে এসব পুরুষের কাজে কি না জড়ালেই নয়? নেলীর জন্য মামার কপালে যে কতো দুর্ভোগ আছে আমি শুধু তাই ভাবি।' ভারি গলায় কথাগুলো বলে মা আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বাবা মৃদু হাসলেন—'দুর্ভোগ তো তোমারও কম নয় শানু। নেলী কি করেছে বলবে তো?'

মা শুকনো গলায় বললেন, 'আমার দুর্ভোগ কে আর দেখছে বলো। ফি হপ্তায় এতো যে লিখি, ও কি আমার কথা গ্রাহ্যি করে? তুমি বলছো কি করেছে? কি করে নি তাই বলো না! ওই হানাবাড়িটা কেনার পর থেকে অঘটন লেগেই আছে। এবার সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই।'

বাবা হাল ছেড়ে হাই তুললেন। খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, 'সর্বনাশের কি হলো না বললে বুঝবো কি করে?'

মা গম্ভীর হয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর বাবাকে বললেন, 'তোমার গুণধর ছেলে দলবল নিয়ে গরমের ছুটিতে নুলিয়াছড়িতে গিয়ে কতগুলো পাজি গুণ্ডোর পেছনে লেগে, খবরের কাগজে ছবি ছেপে ভেবেছে না জানি কি দিগ্বিজয় করেছে। ওদিকে পাকড়াশী না টাকড়াশী নেলীর জান কয়লা করে দিচ্ছে। শয়তানটার সঙ্গে নাকি সরকারের ওপর মহলের যোগসাজস আছে। থানার হাজত থেকে বেরিয়ে নেলীর পিছনে লেগেছে। ওর দলের লোকেরা যখন-তখন বাড়িতে এসে যা খুশি বলে যাচ্ছে। গোয়ালা দুধ দেয়া বন্ধ করেছে। তিন মাস নাকি কোনো গেস্ট আসে নি। আরও কত কি যে করছে চিঠিতে নেলী সব লিখেছে।'

মার কথা শুনে বাবা গম্ভীর হয়ে হাতের খবরের কাগজটা একপাশে ভাঁজ করে রেখে বললেন, 'চিঠিটা আমাকে একবার দেখতে দেবে?'

মা বসেই ছিলেন। ইশারায় আমাকে বললেন, চিঠিটা বাবাকে দিতে। নেলী খালার চিঠি পড়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি সেটা মার হাত থেকে নিয়ে বাবাকে দিলাম। চিঠি পড়তে গিয়ে বাবার কপালে ভাঁজ পড়লো। পড়া শেষ করে বললেন, 'আমার মনে হয়, নুলিয়াছড়িতে থাকা নেলীর আর উচিত হবে না।'

মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—'চিঠির গুরুত্বটা তাহলে তুমিও বুঝতে পেরেছো! আমি তো ভেবেছিলাম প্রত্যেকবার যা করো—এবারও হেসে উড়িয়ে দেবে।' এই বলে মা বিছানা ছেড়ে উঠলেন—' তোমাদের তাহলে চা দিতে বলি।'

নেলী খালাকে নিয়ে ভাবনার দায়িত্বটা বাবার কাঁধে তুলে দিয়ে মা নিশ্চিন্ত মনে রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

আমি বাবাকে বললাম, 'নেলী খালার চিঠিটা একবার পড়তে দেবে?'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন। মাকে নেলী খালা লিখেছেন—

'ভেবেছিলাম কথাগুলো তোমাকে বলবো না। কিন্তু জাহেদ বললো, বিষয়টা তোমাদের জানানো দরকার। লিখতে বসেও ভেবে পাচ্ছি না কিভাবে লিখবো। আসলে গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে সেই স্মাগলারটাকে ধরার পর থেকে। বদমাশ পাকড়াশী যে মন্ত্রীর পেয়ারের লোক তখন কি ছাই জানতাম! জামিনে ছাড়া পেয়ে সে আমাকে তুর্কি নাচন নাচাচ্ছে। ভেবেছিলাম বাড়িতে কিছু পেইং গেস্ট রেখে কেনার খরচ কিছুটা তুলবো। তুমি তো জানো আব্বুর পেনশনের টাকায় আমি হাত দিতে চাই না। আবিররা দেখে গেছে গেস্ট একজন দু'জন করে আসা শুরুও করছিলো। অথচ গত চার মাস ধরে বাড়িতে কোনো গেস্ট আসছে না। শয়তান পাকড়াশী আবোল-তাবোল কথা বলে গোয়ালা, ধোপা, পিয়নদের আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। সেদিন তোমার চিঠি দিতে এসে হরলাল পিয়নের সে কি কান্না! বলে, দিদিমণি, বউ ছেলেপুলে

নিয়ে সংসার করি। পাকড়াশী মশাই বলেছেন, আপনার বাড়ির তল্লাটে দেখলে নির্বংশ করবে। আমায় মাফ করে দেবেন দিদিমণি। মাস্টার সাহেবকে বলেছি, চিঠি এলে তুলে রাখতে। আপনি বড়িবিকে পাঠিয়ে এনে নেবেন। হরলালের কি দোষ বলো! ভাগ্যিস পোস্ট মাস্টার ভালো মানুষ। নইলে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতো না। শুধু হরলাল আর গোবিন্দ গোয়ালা নয়, ভয় দেখিয়ে আমাদের বুড়ো মালিটাকেও তাড়িয়েছে। আব্বু, আমি আর বড়িবি ছাড়া বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। এতো বড়ো বাড়িটা সারাদিন খাঁ-খাঁ করে। পাকড়াশী শেষ পর্যন্ত জাহেদকেও বদলি করে ছেড়েছে। সিলেটের কোন জঙ্গলে না পাহাড়ে নাকি ওর পোস্টিং হয়েছে। পাকড়াশীর হাতে এভাবে অপদস্থ হয়ে আমার মনের অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে বলে বোঝাতে পারবো না। জাহেদ চলে গেলে এ বাড়িতে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আব্বু বলেছেন, বিক্রি করে দিতে। পাকড়াশী বদমাশটা তাও করতে দেবে না। শয়তানি করে লোক পাঠিয়ে বলেছে, শ'খানেক টাকায় যদি বেচি তাহলে ও কিনবে। কতো বড়ো ধড়িবাজ একবার ভেবে দেখ!

জাহেদ বলছে ওর সঙ্গে যেতে। আব্বুও রাজি হয়েছেন। জাহেদ চায় যাওয়ার আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে। এই দুঃসময়ে কোনো অনুষ্ঠানের আমি মোটেই পক্ষপাতি নই। তোমাদের শুভেচ্ছা পাবো এ বিশ্বাস আমার আছে। বিয়েতে নেমন্তন্ন করছি না বলে আবির যেন রাগ না করে। ওর বন্ধু লিলি টুনির মা মীরাবুকেও আমি চিঠি দিয়েছি। বলেছি সিলেটে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসে সবাইকে নেমন্তন্ন করবো।

যাই বলো শানুপা, এতো সুন্দর করে সব কিছু গুছিয়েছি, ছেড়ে যেতে একটুও মন চাইছে না। আরো একটা কারণে আমি এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চাই না, যা তোমাকেও বলতে পারবো না। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি—তোমাদের নেলী।

বার দুয়েক পড়ে নেলী খালার চিঠিটা বাবাকে ফেরত দিলাম। বললাম, 'নেলী খালাকে আমাদের এখানে আসতে লিখে দাও না বাবা।'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখি তোমার মা কি বলেন! তোমার মাকে—।'

বাবার কথা শেষ না হতেই মা নিচের তলার রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্য চা আর নারকেল কোরার সঙ্গে চিনি দিয়ে চিড়েভাজা মাখিয়ে আনলেন। বাবা বললেন, 'তুমি আবার কষ্ট করে ওপরে আসতে গেলে কেন? আমরাই তো নিচে যেতে পারতাম।'

বাবার কথায় কান না দিয়ে মা বললেন, 'নেলীকে বরং এখানে আসতে বলি। ও ছেলেমানুষ, বাড়ি বিক্রি করা কি চাট্টিখানি কথা!'

বাবা চিড়েভাজা চিবুতে চিবুতে বললেন, 'বিক্রির চেয়ে কেনা আরো বেশি ঝামেলার। নেলী একাই তো বাড়ি কিনেছে।'

বাবার কথা শুনে মা বিরক্ত হলেন—'তার মানে নেলীকে তুমি তোমার বাড়িতে আসতে বলবে না, এইতো? তাহলে আমাকেই নেলীর কাছে যেতে হবে। ওর এই বিপদে আমি—' এই বলে মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কি! ওকে আমি আসতে বলবো না কেন? তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো। একটু আগে বরং আমিই বলছিলাম, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেলীকে আসতে বলবো।'

মা এক গাল হেসে বললেন, 'পরামর্শের আর কি আছে! আসতে লিখে দিলেই তো হয়। ও এলে বরং পরামর্শ করা যাবে।'

মার মুখে হাসি দেখে বাবার মুখেও হাসি ফুটলো—'ও মানে ও তো আর একা নয়। মামাও নিশ্চয়ই সঙ্গে আসবেন।'

'শুধু মামা কেন!' মা বললেন, 'বড়িবিও আসবে। একা ওই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকলে বুড়ি একদিনেই পটল তুলবে।'

আমি বললাম, 'স্ক্যাটরাকে তোমরা বাদ দিচ্ছো কেন?'

স্ক্যাটরা হলো নেলী খালার আদরের কুকুর। ওর বাবা ছিলো গ্রে হাউণ্ড, মা স্প্যানিয়েল। এতো বড়ো কুকুর, অথচ দেখলে মনে হবে সারাক্ষণ যেন হাসছে। স্ক্যাটরার কথা শুনে বাবা-মা দু' জনেই হেসে ফেললেন। মা বললেন, 'তুই কি ভেবেছিস নেলী ওটাকে ফেলে আমার এখানে আসবে?'

বাবা-মার মন ভালো দেখে আমি বাবুর চিঠির কথা বললাম। বাবা বললেন, 'জামি আমাকে কদিন আগে জানিয়েছিলো ওকে জাপান বদলি করা হতে পারে। কবে দেশে আসবে সে সব কথা লেখে নি।'

মা বললেন, 'তোমার ভাইয়ের তো আবার সায়েবি স্বভাব। সেবার এসে উঠলেন হোটেলে। এবার আমাদের এখানে উঠতে হবে, বলে দিও।'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি বরং জামিকে আজই একটা চিঠি দাও।'

আমি বললাম, 'বাবু লিখেছে, চিঠি লিখলে পাবে না। ওরা অল্প কয়েক দিনের ভেতর এসে পড়বে।'

মা বাবাকে বললেন, 'রাতে ট্রাংকলে কথা বলো না। কোন ফ্লাইটে আসছে জানলে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে ওদের এখানে নিয়ে আসতাম।'

আমি মার দিকে তাকালাম। মাকে দু' হাতে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছে হলো। মা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, 'বড়দিনের ছুটিটা মনে হচ্ছে আবিরের ভালোই কাটবে।'

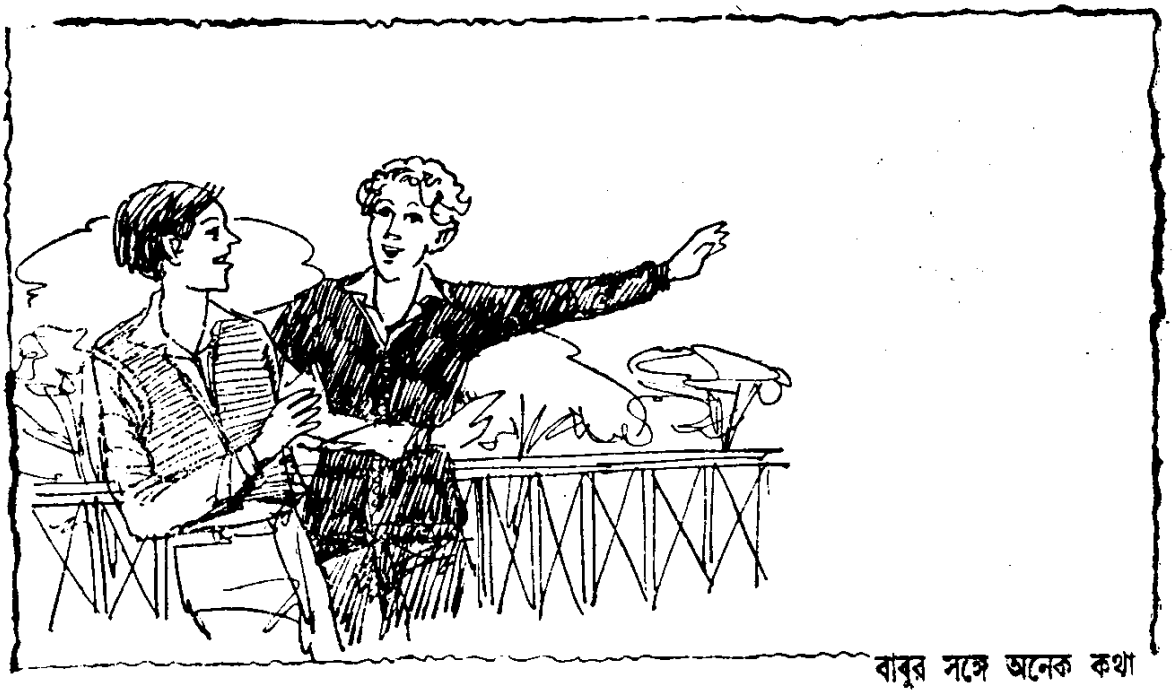

বাবুর সঙ্গে অনেক কথা

মার সঙ্গে টেলিফোনে মেজো কাকার কথা হয়েছে তিন দিন আগে। তারপরই শুরু হলো বাড়িতে চুনকাম আর রঙের ধুন্ধুমার কাণ্ড। কাল মেজো কাকাদের আসবার কথা। ক'দিন ধরে বাড়িতে কাজের অন্ত নেই। রোজকার মতো কাজশেষে মা রঙ মিস্ত্রিদের কাজের হিসেব নিয়ে বসেছেন। কারা ভালো কাজ করেছে, কারা ফাঁকি দিয়েছে, মিস্ত্রিদের এসব বোঝাচ্ছেন। আমি ক্ষেন্তির মাকে নিয়ে ড্রইং রুম গোছাচ্ছি। এমন সময় দরজায় কলিং বেলের শব্দ।

মা বললেন, 'অসময়ে কে এলো দেখো তো।'

ক্ষেন্তির মা ঘর মুছতে মুছতে বিরক্ত হয়ে বললো, 'কেউ না মা, আজকাল ফকির-গুলোন পর্যন্ত বেলের বোতাম ধরে টেপে।'

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। তাকিয়ে দেখি, মেজো কাকা আর বাবু সামনে দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে বললাম, 'এ কি, তোমরা!'

নেলী খালার ভাষায় ক্ষুদে ওমর শরীফের মতো দেখতে বাবুর মুখে ওর সেই বিশ্বজয়ী হাসি। মেজো কাকাও মৃদু হাসছিলেন।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস?' বলতে বলতে মা এসে আরো অবাক হলেন—'তোমাদের না কাল আসার কথা! আমরা সবাই এয়ারপোর্ট যাবো, গাড়ি ঠিক করেছি—'

মেজো কাকা বিব্রত হেসে বললেন, 'ফ্লাইটের একটা বিশেষ সুবিধে পেয়ে গেলাম—আজ এসে তোমাদের অসুবিধেয় ফেলি নি তো!'

মা রাগ দেখিয়ে বললেন, 'ও কি কথা জামি! এ বাড়িতে বাপু তোমার বিলেতি ভদ্রতা চলবে না। এসব আদিখ্যেতার ভূত আমি নেলীর ঘাড় থেকেও নামিয়ে দিয়েছি।'

মেজো কাকা শব্দ করে হাসলেন—'তুমি সবই পারো শানু ভাবী।' এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'বাহ্, আবির দেখছি বাবুর চেয়েও লম্বা হয়ে গেছো! বাবুর কাছে শুনলাম ক্লাসের ফার্স্ট প্লেসের দখলিস্বত্বটা তুমি এখনো ছাড়ো নি!'

'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবে নাকি?'

মার তাড়া খেয়ে সবাই মিলে মেজো কাকাদের বাক্সপত্র সব ঘরে আনলাম। মেজো কাকা ড্রইং রুমে বসে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—'আহ্, কতদিন পর দেশে ফিরলাম বলো তো শানু ভাবী!'

বাবু আমাকে বললো, 'ওপরে চলো আবির, তোমার জন্য কি এনেছি দেখবে। জেঠিমা, আমি আবিরের ঘরে থাকছি তো?'

মা হেসে বাবুর চিবুক নেড়ে আদর করে বললেন, 'তোমার যেখানে ভালো লাগে সেখানেই থাকবে।'

আমরা দু'জন দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে চিলেকোঠার ঘরে এলাম। দোতালায় চারটা ঘর খালি পড়ে থাকলেও আমার ভালো লাগে চিলেকোঠার ঘরে থাকতে। চারপাশের বাড়িগুলো নিচু হওয়াতে ও ঘরটাকে মনে হয় জাহাজের কেবিনের মতো। জাহাজের এই কেবিনে বসে আমি সারা বছর ঘুরে বেড়াই সাগর থেকে মহাসাগরে, অজানা অচেনা সব দ্বীপ আর বন্দরে। ভাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে আমি আরো একা হয়ে গেছি। স্কুলেও কোনো বন্ধু নেই। বাবু ছাড়া আমার নতুন বন্ধু ললি, টুনি থাকে চট্টগ্রামে। জাহাজে আমার উদগ্রীব সময় কাটে ওদের চিঠির অপেক্ষায়।

বাবু ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে বললো, 'ঘরটা চমৎকার সাজিয়েছো তো! চে-র পোস্টারটা সুন্দর মানিয়েছে।'

বাবুর সঙ্গে গতবার ভাইয়াদের গোপন দলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ও চে গুয়েভারার কথা বলেছিলো। তারপর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে চে-র মস্তো বড়ো একটা পোস্টার পাঠিয়েছে। ওকে আমি লিখেছিলাম চে-র পোস্টারটা আমার ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে।

বাবু বললো, 'এবার তোমার জন্য আমি এনেছি মাও সেতুঙের ছবি খোদাই করা কোট-পিন, ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীদের ওপর লেখা কয়েকটা বই আর বাবা এনেছেন জামা-কাপড়।'

আমি হেসে বললাম, 'তুমি দেখছি আমাকে বিপ্লবী বানিয়ে ছাড়বে!'

'চে-র ছবি দেয়ালে ঝোলালেই বিপ্লবী হওয়া যায়, এ কথা তোমাকে কখন বললাম! গতবার তুমি জানতে চেয়েছিলে, তাই আনলাম।'

'ললি, টুনির জন্য কিছু আনো নি?'

গতবার গরমের ছুটিতে নুলিয়াছড়ি বেড়াতে গিয়ে আমাদের দু'জনের সঙ্গে নেলী খালার বান্ধবীর দুই মেয়ে ললি টুনির সঙ্গে চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছিলো। বাবুর সঙ্গে খাতির বেশি ছিলো টুনির, যদিও দু'জন সারাক্ষণ একে অপরের পেছনে লেগে থাকতো। ওদের দু'জনের স্বভাবই অমন। আমার কথা শুনে বাবু একটু লাল হয়ে বললো, 'টুনিকে আমি লিখেছিলাম কি আনতে হবে। ও লিখেছে কিছুই লাগবে না, শুধু পিঠের চামড়াটা একটু পুরু করে আনতে হবে, যাতে ওরা দুই বোন মনের সুখে চিমটি কাটতে পারে।'

আমি হেসে ফেললাম—'টুনি ওভাবেই চিঠি লেখে। জানো না তো, আমাকে গত চিঠিতে লিখেছে—ললিপা বলে আপনি নাকি নিজেকে ভীষণ একা ভাবেন, মনে ভারি দুঃখ। আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে একটা ছবি পাঠালাম। পড়ার টেবিলে গ্লাসের নিচে রেখে দেবেন আর ভাববেন এরা আমার বন্ধু। তাহলে সব দুঃখ-টুঃখ চলে যাবে। চিঠি পড়ে কাগজে

মোড়ানো ছবিটা দেখে ভাবলাম ওদের দু'জনের ছবি বুঝি। খুলে দেখি কি কাণ্ড, মুখ কালো দুটো হনুমানের ছবি, মুখোমুখি বসে আছে গালে হাত দিয়ে।'

বাবু হেসে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো, 'তাহলে দেখছি, তোমাকেও জব্দ করতে পেরেছে! চিঠির জবাব দাও নি?'

'দিয়েছি। আমি লিখেছি—টুনি, তোমাদের দুই বোনের ছবি দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। আমার যতদূর মনে আছে তোমাদের চেহারা এরকম বাঁদুরে আর কুচকুচে কালো ছিলো না। এতো বড়ো লেজটা কিভাবে প্যান্টের ভেতর লুকিয়ে রাখতে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। নাকি তখন ওটা এতো বড়ো ছিলো না? আশা করি পরের চিঠিতে জানাবে। তোমার কথা মতো ওটা গ্লাসের নিচে রেখেছি, বন্ধুও ভাবছি, তবু মনটা খারাপ হয়ে আছে। দুঃখ আরো বেড়েছে তোমাদের অবস্থা দেখে। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার থাকলে জানাবে।' হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'জবাব পছন্দ হয়েছে?'

বাবু চোখ বড়ো বড়ো করে বললো, 'তুমি দেখছি ওর চেয়ে কম নও!' তারপর একটু ভেবে আবার বললো, 'আসলে আমি তোমার মতো লিখতে পারি না। তাই আমাকে প্রত্যেক চিঠিতে জব্দ করে।'

'তাই বলে ওদের জন্যে কিছু আনো নি বুঝি!'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন।' বাবুর মুখে আবার হাসি ফুটলো—'ওদের জন্য দুটো পুতুল এনেছি। একটা চাইনীজ আরেকটা জাপানী। তুমি তো জানো, পুতুল পেলে ওরা আর কিছু চায় না। মজার চকলেটও এনেছি দু' বাক্স।'

'ছেলেমানুষ।' হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'আজকাল তুমিও ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো বাবু। টুনিকে তুমি চিঠিতে কি কি লিখেছো সব ললি আমাকে লিখেছে।'

বাবু আমার পিঠ চাপড়ে বললো, 'তুমি হলে মস্তো এক গুরুমশাই। ললিকে তুমি চিঠিতে কি লেখো টুনি বুঝি আমাকে জানায় নি ভেবেছো?'

গম্ভীর হতে গিয়ে আমি হেসে ফেললাম—'কি পাজি মেয়েরে বাবা! এবার থেকে দেখছি সাবধানে লিখতে হবে।'

বাবু হাসতে হাসতে বললো, 'আমাকেও তাহলে সাবধান হতে হয়!'

আমরা দু'জন চিলেকোঠার ঘরে সারা দুপুর, সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, এমনকি প্রায় সারা রাত গল্প করলাম।

রাতে খাবার টেবিলে মেজো কাকা বললেন, 'তোমাদের কথার থলে কি কখনো খালি হবে না?'

মা হেসে বললেন, 'ওরা এমনই। কত রাজ্যির কথা যে ওদের জমে থাকে, আল্লাই জানেন!'

বাবু প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললো, 'মুড়িঘণ্টটা চমৎকার হয়েছে।'

মা তক্ষুণি বড়ো এক চামচ মুড়িঘণ্ট বাবুর পাতে তুলে দিলেন। আমি শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়ে বাবুর চোখ পাকানো আর মার ভুরু কোঁচকানো দেখে হাসি চাপলাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে বাবুকে নেলী খালার বিপদের কথা জানালাম। চিঠিতে কি লিখেছেন সবই বললাম। সবশেষে বললাম, 'দু'-এক দিনের মধ্যেই নেলী খালা এসে যাবেন।'

নেলী খালার বিপদের কথা শুনে বাবু চিন্তিত হলো। আসবেন শুনে খুশিও হলো। বললো, 'কিসস্যু ভেবো না আবির। আমরা ঠিকই পাজি পাকড়াশীটাকে জব্দ করবো। মনে হচ্ছে শয়তানটার যথেষ্ট শিক্ষা হয় নি।'

বাবুর উৎসাহ আর মনের জোর আমার ভালো লাগলো। তবে ব্যাপারটা ও যতোটা সহজ ভেবেছে ততোটা সহজ নয়। বললাম, 'বাবাকে আমি এ রকম কথাই বলেছিলাম। বাবা শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছেন, এটা তোমাদের নুলিয়াছড়ির এ্যাডভেঞ্চারের মতো মজার কোনো ব্যাপার নয়। অনেক জাঁদরেল লোকজন এর সঙ্গে জড়িত।'

আমার কথা শুনে বাবু কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। মনে হলো নেলী খালা কতখানি বিপদে পড়েছেন বোঝার চেষ্টা করছে। বিছানা থেকে উঠে ও টেবিলে রাখা বোতল থেকে পানি খেলো। তারপর আমার পাশে বসে বললো, 'তুমি যে সেবার অপু ভাইর কথা বলেছিলে তাঁর সঙ্গে কি নেলী খালার যোগাযোগ আছে?'

ভাইয়ার সঙ্গে নেলী খালার যোগাযোগ আছে একথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তিন বছর আগে ভাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বিপ্লবীদের গোপন দলে যোগ দিয়েছে। নেলী খালা বারবার বারণ করে দিয়েছেন ভাইয়ার কথা যেন কাউকে না বলি। বাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'একথা কেন জিজ্ঞেস করছো?'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীর ওপর কিছু ছবি দেখেছি। ওখানকার অনেক দেশের অবস্থা আমাদের মতো। পুলিশরা কোনো কাজ করে না। ভালো লোকদের দুর্ভোগের শেষ নেই। খারাপ লোকদের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে থাকে। সেখানে বিপ্লবীরা খারাপ লোকদের বিচার নিজেরা করে, সাজাও দেয় নিজেরাই। যে জন্যে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিপ্লবীদের ভালোবাসে, পুলিশের হামলা থেকে ওদের বাঁচায়।'

'তুমি বলতে চাইছো নেলী খালাকে ভাইয়াদের দল সাহায্য করতে পারে?'

'যদি সত্যিকারের বিপ্লবীদের দল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এ ধরনের বিপদের সময়ে তাদের এগিয়ে আসা উচিত।'

বাবুর কথা শুনে অনেকখানি ভরসা পেলাম। নেলী খালা ভাইয়াদের দলকে নানাভাবে সাহায্য করেন, এটা গতবার নুলিয়াছড়ি গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। তবে নেলী খালা চিঠিতে যেভাবে লিখেছেন, মনে হয় ভাইয়াদের তিনি কিছু জানান নি। হয়তো এসব ব্যাপারে ওদের তিনি জড়াতে চান না। নেলী খালার সঙ্গে দেখা হলেই সব জানা যাবে। বাবুকে মিথ্যে কথা বলতে খারাপ লাগলো। তবু বললাম, 'অনেকদিন ভাইয়ার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। কোথায় আছেন তাও জানি না।'

'চিটাগাঙেই তো আছেন?' জেরা করলো বাবু।

'বোধ হয়। শেষ চিঠি ওখান থেকেই পেয়েছিলাম। '

'গোপন পার্টির কাজের জন্য জায়গাটা খুবই ভালো।'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। কোন কথা থেকে কি বুঝে ফেলবে, এ নিয়ে বেশি না বলাই ভালো। কিছুক্ষণ পর বাবু বললো, ' তোমার কি কখনো ইচ্ছে করে না বিপ্লবীদের গোপন দলে যোগ দিতে?'

বাবুর এ কথার যে জবাব আমি জানি, সেটা ওকে বলা উচিত হবে কিনা এ নিয়ে একটু ভাবলাম। ও চায় আমি হ্যাঁ বলি। তারপর ও বলবে, চলো অপু ভাইদের খুঁজে বের করি। প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্য বললাম, ' এ নিয়ে আমি কিছু ভাবি নি।' একটু থেমে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টুনি তোমাকে ললির কথা কি লিখেছে বাবু?'

বাবু মুখ টিপে হাসলো—'তোমার চিঠি কম করে হলেও ললি দশবার পড়ে।'

'আর?'

'টুনি ওকে সব সময় তোমার কথা বলে খেপায়।'

'আর?'

'ললি আমাকে বলে ছেলেমানুষ।'

'আর?'

'তুমি ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ব্যস, আর কিছু নেই।'

আমি ললির কথা ভাবলাম। আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় ও আমার চেয়ে বেশি ভাবে। ওর হার্টে কি একটা শক্ত অসুখ আছে, আমাকে এখনো খুলে বলে নি। ডাক্তার ওকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে বলেছে। রাশান পুতুলের মতো ফর্সা মিষ্টি চেহারা চশমা পরা বিষণ্ণ চোখের মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয় অনেক দুঃখ ওর।

বাবু কিছুক্ষণ পর বললো, 'আবির কি ঘুমিয়ে পড়েছো?'

'না, কেন? তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'না তো! চুপচাপ কি ভাবছো?'

'তুমি যা ভাবছো আমিও তাই ভাবছি।'

'আমি কি ভাবছি জানলে কিভাবে?'

'না জানলে বন্ধু কেন?'

'এখন তো ললিও তোমার বন্ধু।'

'ললি কি তোমার মতো?'

বাবু একটু চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'এই চার মাসের মধ্যে আমাদের দু'জনের মাঝখানে দুটো মেয়ে বন্ধু এসে গেছে। কি অদ্ভুত, তাই না?'

'অদ্ভুত কেন?'

'নুলিয়াছড়ি যাওয়ার আগে কখনো ভাবতে পেরেছিলে?'

'নুলিয়াছড়িতে বন্ধু পেয়ে যাবো ভাবি নি। তবে তুমিই তো বলতে আমাদের দু'জন মেয়ে বন্ধু থাকলে বেশ হয়।'

'ওখানে আমার সঙ্গে যারা পড়ে তাদের সবারই মেয়ে বন্ধু আছে। ওরা জানতে চাইতো আমার নেই কেন।'

'ওখানে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই তো পারতে।'

'তোমাকে তো আগেও বলেছি আবির, ওখানকার মেয়েদের আমার ভালো লাগে না।'

'টুনিকে ভালো লাগে?'

'লাগে, তবে ও খুবই ছেলেমানুষ।' একটু চুপ থেকে বাবু আবার বললো, 'জানো, একদিন চিঠিতে লিখেছে ওর নাকি ভারি ইচ্ছে আমার মাথাটা ন্যাড়া করলে কেমন লাগে তাই দেখবে। চার্লি ব্রাউনের একটা ছবি পাঠিয়েছে। নিচে লিখেছে আমার নাম।'

আমি হাসলাম—'টুনি আসলেই খুব ছেলেমানুষ।'

বাবু আস্তে আস্তে বললো, 'ওর এই ইনোসেণ্ট ছেলেমানুষি স্বভাবটাই আমার ভালো লাগে।'

হঠাৎ কেমন যেন ঈর্ষামতো হলো টুনির ওপর। বললাম, ' আমার কি ভালো লাগে তোমার?'

বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার ম্যাচিউরিটি আমার ভালো লাগে। তুমি খুব সেনসিটিভ। এটাও আমার ভালো লাগে।'

আমি একটু পরে ওর কাছে আবার জানতে চাইলাম, 'ললির কোন দিকটা ভালো লাগে?'

'ললিও তোমার মতো সেনসিটিভ। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বোঝে। তোমার খুব ভালো বন্ধু হবে ও।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'ললির জন্য হিংসা হয় না?'

'হিংসা কেন হবে?' বাবু একটু অবাক হলো।

'তোমার বন্ধুত্বে ভাগ বসাচ্ছে বলে?'

বাবু মৃদু হাসলো—'আমার বন্ধুত্বে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। ললি থাকবে ললির জায়গায়, আমি থাকবো আমার জায়গায়, যেখানে এতোদিন ধরে আছি।'

বাবুর কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগলো। বললাম, 'তুমি এতো সুন্দর বলতে পারো বাবু!'

'তোমার মতো সুন্দর লিখতে যদি পারতাম!'

ললিও আমার লেখার খুব প্রশংসা করে। ওর ধারণা বড়ো হলে আমি নাকি নামকরা লেখক হবো। এদিকে বাবা ঠিক করে রেখেছেন আমাকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। যদিও ইলেকটিভ ম্যাথ আমার দু'চোখের বিষ, ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর তুলতে ঘাম ছুটে যায়। তবু কিছুই করার উপায় নেই। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভাইয়া চলে যাওয়াতে বাবা ভেতরে ভেতরে অনেক ভেঙে পড়েছেন। ভাইয়া যখন মুক্তিযুদ্ধে গেলেন তখন বাবা রীতিমতো গর্বিত ছিলেন। অথচ এখন ভাইয়ার কথা উঠলে ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান। যে জন্য বাবা কষ্ট পাবেন বলে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমি সায়েন্স পড়ছি। ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াটাকে আমি মোটেই বাহাদুরির কাজ মনে করি না। অন্য ছেলেরা ফার্স্ট হতে না চাইলে আমি কি করবো!

বাবু অবশ্য পড়াশোনায় অনেক শার্প। ওখানকার স্ট্যাণ্ডার্ডই আলাদা। ওর কাছে আমাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ পানির মতো সোজা। ভাগ্যিস বাবু আমার সঙ্গে পড়ে না। তাহলে ক্লাসে আমার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যেতো। শুধু বাংলা দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না।

বাবু আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো আবির?'

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেই বাবু এটা জানতে চাইবে। বললাম, 'তুমি যদি আমাদের ক্লাসে পড়তে, ফার্স্ট হওয়া আমার কপালে জুটতো না।'

'এক সাবজেক্ট ফেল করলে কি তোমাদের এখানে প্লেস দেয়?

'কেন, ফেল করবে কেন?'

'বাংলায় আমি কোনোকালেই পাশ করতাম না।'

'বললেই হলো!'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আবির। আমি তোমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়লেও ফার্স্ট প্লেস তোমার থাকতো।'

'পড়াশোনায় তুমি যে আমার চেয়ে অনেক শার্প, এটা অস্বীকার করছো কেন?'

বাবু হেসে বললো, 'তোমার সঙ্গে আমি কম্পিটিশনে যাবো এটা তুমি ভাবতে পারলে কি করে আবির?'

বাবুর কথার ধরনে আমিও হেসে ফেললাম—'তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারবো না।'

আমাকে নকল করে বাবু বললো, 'তোমার সঙ্গে লেখায় আমি পারবো না।'

দূরে দমকল অফিসের পেটাঘড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজলো। আমি বললাম, 'বাবু, এবার ঘুমোনোর চেষ্টা করা দরকার। অনেক লম্বা জার্নি করেছো। এখন না ঘুমোলে শরীর খারাপ করবে।'

'ঘুম আসছে না,' বললেও বাবু কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ঘুমোবার আগে পেটাঘড়িতে রাত সাড়ে চারটার ঘণ্টা শুনেছিলাম।

নেলী খালার আসল বিপদ

সকালে ক্ষেন্তির মার চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙলো। ঘুমের ঘোরে দরজার বাইরে ওর চ্যাঁচানো শুনে মনে হলো বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে। হঠাৎ শুনি ও বলছে, 'ও ছোট মেয়া আর কত ঘুম পাড়বে? উঠে দেখ নাগো! মেম খালারা আসিছে।'

নেলী খালাকে ক্ষেন্তির মা বলে মেম খালা। গত বছর কদিনের জন্য বেড়াতে এসে ছিলেন নেলী খালা। তখন থেকে ক্ষেন্তির মা ওঁর দারুণ ভক্ত।

নেলী খালার কথা শুনে ঘুম-টুম সব হাওয়া হয়ে গেলো। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। বাবু তখনো ঘুমোচ্ছিলো। ওর ঘুম ভাঙিয়ে বললাম, 'শিগগির নিচে চলো, নেলী খালারা এসেছেন।'

দোতলার বাথরুমে মুখ ধুয়ে নিচের তলার ডাইনিং রুমে এসে দেখি সবাই খাবার টেবিলে বসে আছেন। নেলী খালার মুখটা শুকনো মনে হলো। সারারাতের জার্নির জন্য হতে পারে। আমাদের দেখে মিষ্টি হাসলেন—'এই যে হিরোরা! কাল সারারাত নিশ্চয়ই জেগে ছিলে। চোখে তো এখনো ঘুম লেগে আছে!'

মা বললেন, 'ওরা এ রকমই। এতো কি কথা ওদের জমে থাকে আল্লাই জানেন।'

আমি আর বাবু চেয়ার টেনে বসলাম। নেলী খালাকে বললাম, 'তোমরা এতো তাড়াতাড়ি আসবে ভাবি নি। মা কাল বলছিলেন, সব কিছু গুছিয়ে আসতে আসতে আরো তিন, চার দিন লাগবে।'

নেলী খালা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'গোছাবো কি, প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি এই তো ঢের।'

নানু গম্ভীর গলায় বললেন, 'নেলী, খাওয়ার সময় ওসব কথা থাক না।'

বাবু আমাকে টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে চিমটি কাটলো। আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, 'নেলী খালা, এবার কিন্তু গতবারের মতো হুট করে চলে যেতে পারবে না। দেড় মাস আমার ছুটি। মেজো কাকারাও এবার এখানে থাকবেন। তুমিও জানুয়ারির আগে কোথাও যাবে না।'

'দেড় মাস কি বলছো, দেড় দিনও থাকতে পারবো বলে তো মনে হয় না।' নেলী খালা বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'তবে আব্বু ইচ্ছে করলে থাকতে পারো।'

'মামা তো থাকবেনই নেলী।' মা বললেন, 'তুমিও বাছা অতো তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না। জাহেদকে আমি বুঝিয়ে বলবো।'

মার কথা শুনে মনে হলো এ নিয়ে ওঁদের ভেতর আগে কথা হয়েছে। নেলী খালাকে একা না পেলে কিছুই জানা যাবে না। অথচ সব কিছু না জানা অব্দি মনটা ছটফট করছিলো। তবে নেলী খালার চেহারা দেখে এটুকু অনায়াসে বোঝা যায়— বড়ো রকমের ঝামেলায় পড়েছেন।

বাবু বললো, 'স্ক্যাটরা আসে নি নেলী খালা?'

'এসেছে।' মৃদু হাসলেন নেলী খালা। 'রাতের ট্রেন জার্নি ও মোটেই পছন্দ করে নি। আমাদের কামরায় থাকতে দেয় নি বলে মন খারাপ করে আছে। বড়িবি ওকে ঘোরাতে নিয়ে গেছে।'

আমি আগেও দেখেছি স্ক্যাটরার প্রসঙ্গ উঠলে নেলী খালা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। বললাম, 'স্ক্যাটরার মতো সেনসিটিভ কুকুরের কথা আমি কোনো বইতেও পড়ি নি।'

এই এক কথাতে নেলী খালার মনটা ভালো হয়ে গেলো। মিষ্টি হেসে বললেন, 'আব্বু জানে ওকে আমি কত যত্ন করে ট্রেনিং দিয়েছি। আমাদের বিপদের সময়ে ও ছিলো সবচেয়ে বড়ো সহায়।'

এই বলে হঠাৎথেমে গেলেন নেলী খালা। বুঝলাম নানু পছন্দ করবেন না বলে বিপদের কথা তিনি আর বলতে চাইলেন না।

নাশতা খাওয়ার পর চা খেতে খেতে ভাবছিলাম নুলিয়াছড়ির বিপদের কথা শুনবো। বাবা সেটা আঁচ করতে পেরে বললেন, 'আবির, বাবু, তোমরা ওপরে যাও। তোমাদের নানুর সঙ্গে দরকারি কিছু কথা আছে আমাদের।'

আমি অসহায়ভাবে নেলী খালার দিকে তাকালাম। সবার অজান্তে নেলী খালা চোখ টিপে ওপরে যেতে ইশারা করলেন। আমার সঙ্গে বাবুও সেটা দেখতে পেলো। আমরা দু' জন চা শেষ করে ওপরে এসে কথার ঝাঁপি খুলে বসলাম। এবারের প্রসঙ্গ বলাই বাহুল্য নেলী খালা।

'বাবু, লক্ষ করেছো, নেলী খালার চেহারা কেমন যেন ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।'

বাবু গম্ভীর হয়ে আমার কথায় সায় দিলো—'মনে হচ্ছে বড়ো রকমের বিপদেই পড়েছিলেন।'

'পড়েছিলেন বলছো কেন? আমার তো মনে হয় বিপদ এখনো কাটে নি।'

'নুলিয়াছড়ি থেকে চলে এসেছেন—এখন আর বিপদ কোথায়?' বাবু একটু অবাক হলো।

'আমার মনে হয় বিপদ এখনো কাটে নি। অন্তত নেলী খালার চেহারা আর নানুর কথা

শুনে তাই মনে হলো।'

'নানুর কথায় বিপদের কি পেলে?'

'নেলী খালা আমাদের সামনে বিপদের কথা আলোচনা করুক—নানু ঠিক পছন্দ করছিলেন না।'

'তাতে কি হলো?'

'মনে হচ্ছে বিপদ এখনো রয়ে গেছে।'

বাবু চিন্তিত গলায় বললো, 'কি জানি, আমার কিন্তু মনে হয় না, বিপদ ওঁদের পেছন পেছন এতোদূর আসবে।'

আমার অনুমান যে ঠিক ছিলো দুপুরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর বিশ্রাম নেয়ার কথা বলে নেলী খালা এক ফাঁকে হুট করে আমাদের চিলেকোঠার ঘরে চলে এলেন। ওঁকে দেখে বাবু অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো—নেলী খালা ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় চুপ করতে বললেন। তারপর দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে বিছানায় উঠে বসলেন।

'জানি, সব কিছু না শুনলে তোমাদের পেটের ভাত হজম হবে না, টেনশনের চোটে ঘুম হবে না, সারাক্ষণ মনে মনে আমাকে গাল দেবে। তাই সব বলার জন্য লুকিয়ে চলে এসেছি। শানু আপা এখনো মনে হচ্ছে ঘুমোন নি।'

নেলী খালার কথা শুনে আমি মৃদু হাসলাম—'মা বিছানায় শোয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে ডুবে যান। তুমি নিশ্চিন্তে গলাটা আরো খুলে কথা বলতে পারো।'

নেলী খালা মিষ্টি হাসলেন। সকালবেলা ওঁকে যতোটা বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিলো তার চেয়ে এখন অনেক ফ্রেশ লাগছে। বললেন, 'শানু আপাকে পাকড়াশীর শয়তানির কিছু কথা লিখেছিলাম। সব কথা লিখি নি। জানি, শানু আপার হার্টের অবস্থা ভালো নয়। তবে তোমাদের বলা যেতে পারে।'

আমরা দু'জন নেলী খালার কথা গোগ্রাসে গিলছিলাম। একটু থেমে তিনি বললেন, 'পাকড়াশী আমাকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করেছিলো।'

'বলো কি!' বাবু আর আমি দু'জন একসঙ্গে আঁতকে উঠলাম।

'প্রথমবার আমার জীপের ব্রেকের তার কেটে দিয়েছিলো। প্রত্যেক রোববার সকালে আমি কক্সবাজার যাই। সেই রোববারেও জীপ নিয়ে বেরিয়েছি। পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম ব্রেক কাজ করছে না। ড্রাইভিংটা ভালোভাবে রপ্ত করেছিলাম বলে কোনো রকমে স্কেট করে একটা গাছের সঙ্গে লাগিয়ে জীপটা থামিয়েছিলাম। দেড় গজ এদিক-ওদিক হলে দেড় শ' ফুট নিচে ছিটকে পড়ে ছাতু হয়ে যেতাম।'

কথাগুলো নেলী খালা খুব সহজভাবে বললেন। ততক্ষণে আমার আর বাবুর মাথার চুল সব দাঁড়িয়ে গেছে। 'এসব কি বলছো নেলী খালা! এ যে ইংরেজি থ্রিলার ছবির মতো মনে হচ্ছে!'

আমার কথা শুনে নেলী খালা কাষ্ঠ হাসলেন—'পাকড়াশীর মতো ভিলেন থ্রিলারেও খুব কম পাবে। আরেকবার চেষ্টা করেছিলো খাবারে বিষ মিশিয়ে। স্ক্যাটরা তো সেবার মরতে বসেছিলো। দু'জন বিদেশী লোক মিথ্যে পরিচয় দিয়ে গেস্ট হয়ে এসেছিলো। লোক দুটো ছিলো থাই। কি অমায়িক ব্যবহার! আসার পথে বাজারে কারা নাকি ওদের ভয় দেখিয়েছিলো আমার এখানে না আসতে—সে সবও বলেছে। একদিন খাবার টেবিলে রান্নার প্রসঙ্গ উঠতে একজন বললো, ও নাকি দারুণ থাই স্যুপ রাঁধতে জানে। তোমরা তো জানো,

নতুন নতুন রান্না করা আমার একটা হবি। থাই স্যুপের রেসিপিটা কোথাও পাচ্ছিলাম না। ওরা বলতেই আমি আহ্লাদে গলে গিয়ে বললাম, যতক্ষণ রেঁধে না খাওয়াচ্ছো ততক্ষণ কি করে মানি তুমি দারুণ রাঁধতে পারো। ওরা এটাই চাচ্ছিলো। পরদিন দুপুরে রান্না করলো। বাজারও ওরা করেছিলো। দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি। সবার সামনে স্যুপের বাটি, চমৎকার গন্ধ, চামচে করে মুখে তুলতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা তেলেপোকা এসে আমার বাটিতে পড়লো। বড়িবি কাছেই ছিলো। ছুটে এসে পেয়ালার স্যুপটুকু জানালা দিয়ে কলতলায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে ওর হাত ফসকে পেয়ালাটাও বাইরে চলে গেলো। বেচারি দৌড়ে গেলো সেটা আনতে। একটু পরে শুনি ওর চিৎকার। ছুটে গিয়ে দেখি স্ক্যাটরার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে আর গোঙাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে। বড়িবি বললো, কলতলায় পড়া স্যুপ খেয়ে নাকি এ অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরাকে জীপে তুলে নিয়ে ছুটলাম কক্সবাজারের ভেটেরিন্যারি হসপিটালে। ওখানে ওর স্টমাক ওয়াশ করে ইনজেকশন দিয়ে আনতে আনতে রাত হয়ে গেলো। বাড়িতে এসে শুনি গেস্ট দু'জন হাওয়া। আমাকে দুপুরে পাগলের মতো ওভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে আব্বু থাই দুটোর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ওদের বসতে বলে জাহেদকে খবর দিতে গিয়েছিলেন। জাহেদ শুনেই বললো, এ কাজ আপনাদের গেস্টরাই করেছে। ওরা এসে দেখে পাখি উড়ে গেছে। পরে আব্বুর পেয়ালার স্যুপ পরীক্ষা করে ওতে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিলো।'

নেলী খালার কথা শেষ হওয়ার পর বাবু আপন মনে—'কী শয়তান!' বলে শিউরে উঠলো।

আমার গলা শুকিয়ে তখন কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলে বললাম, 'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, ওই সময় যদি তেলেপোকাটা তোমার বাটিতে না পড়তো—'

'তোদের নেলী খালাকে পরকালের টিকেট কাটতে হতো।' এই বলে নেলী খালা মুখ টিপে হাসলেন।

বাবু অবাক হয়ে বললো, 'নেলী খালা, আপনি হাসছেন!'

নেলী খালা হাসিমুখে বললেন, 'মরার আগে যারা মরার ভয়ে আধমরা হয়ে থাকে ওদের কাপুরুষ বলে বাবু।'

বাবু লজ্জা পেলো। আমতা-আমতা করে বললো, 'না, মানে আমি বলছিলাম, আপনি ভীষণ সাহসী।'

সহজ গলায় নেলী খালা বললেন, 'সেবার নুলিয়াছড়িতে তোমরাও কম সাহস দেখাও নি!'

আমি বলালাম, 'এ দুটো ঘটনার সঙ্গে পাকড়াশী জড়িত, এটা তুমি টের পেলে কি করে?'

'দু'বারই পাকড়াশী চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। ইনফ্যাক্ট পাকড়াশী হাজত থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলো, মিস চৌধুরী, আজ পর্যন্ত অনেকে আমার পেটে লাথি মারার চেষ্টা করেছে। দুঃখের বিষয় তাদের সবাইকে অসময়ে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়েছে। আপনার জন্যেও আমার দুঃখ হচ্ছে। এরপর জীপ দুর্ঘটনার দু'দিন পর লেটার বক্সে চিঠি পেলাম। সাদা খামের ভেতর লাল এক টুকরো কাগজে শুধু লেখা, "আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।" থাই স্যুপের ঘটনার দু'দিন পর আবার সেই একই চিঠি। কাল সকালে নুলিয়াছড়ির বাড়ি ছেড়ে বেরুবার আগে লেটার বাক্সে দেখি আগের মতো সাদা খাম। খুলে দেখি সেই লাল কাগজে লেখা—"আমার দুঃখ আপনার সঙ্গে যাচ্ছে। আশা করি অচিরেই সব দুঃখ শেষ হবে।"

'থানায় ডায়েরি করাও নি?'

আমার কথার জবাবে নেলী খালা ম্লান হাসলেন—'থানা-পুলিশের ওপর তোরা খুব ভরসা করিস, তাই না! পাকড়াশী সব কটাকে টাকা খাইয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে।'

আমার মনে পড়লো, মাকেও নেলী খালা লিখেছিলেন থানা-পুলিশ সব ওদের দলে। আমি বললাম, 'জাহেদ মামা ছাড়া ওখানে আর কেউ এসব জানে?'

মুহূর্তের জন্য নেলী খালার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। মিষ্টি হেসে তিনি বললেন, 'আসার সময় চিঠিতে সব জানিয়ে এসেছি।'

অবাক হয়ে বাবু জিজ্ঞেস করলো, 'কার কথা বলছেন?'

'কেন, বুড়ো মুৎসুদ্দী!' রহস্যভরা গলায় নেলী খালা বললেন, 'নুলিয়াছড়ির চিল্লানো-রাস মুৎসুদ্দীর কথা নিশ্চয় ভুলে যাও নি।'

'মানে তানভীর সাহেব? তিনি কি এখনো কক্‌সবাজার আছেন?' বাবু যাচাই করতে চাইলো নেলী খালা সত্যি কথা বলছেন কিনা।

'ওঁর পোস্টিংই তো ওখানে।' নির্বিকার গলায় বললেন নেলী খালা।

আমি জানতে চেয়েছিলাম ভাইয়া এসব জানে কিনা। নেলী খালা আমার কথা ঠিকই বুঝেছেন, অথচ বাবুকে কিছুই বুঝতে দিলেন না। আবার আগের কথায় ফিরে গেলাম, 'তুমি তাহলে ভাবছো পাকড়াশী পাথারিয়া গিয়েও তোমাদের জ্বালাতে পারে?'

'আমি অতোটা ভাবি নি। এটা জাহেদের ধারণা। জাহেদকেও ও থ্রেট করেছে। বলেছে বদলিটা কোনো সাজা নয়, ওকেও নাকি উচিত সাজা দেবে পাকড়াশী। যাতে ভবিষ্যতে ওকে ঘাঁটাবার সাহস কারো না হয়।'

বাবু বললো, 'আমার মনে হয়, নেলী খালা, আপনার ধারণাই ঠিক। আপনারা যখন নুলিয়াছড়ি ছেড়ে চলেই এসেছেন, তখন পাকড়াশীর কোনো অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়। প্রথম থেকেই তো ওখানে আপনাদের থাকার ব্যাপারে ওর আপত্তি ছিলো।'

'সে জন্যেই তো এতো বিপত্তি।'

আমার কথার ধরন দেখে নেলী খালা আর বাবু দু'জনেই হেসে ফেললো। নেলী খালাকে হাসতে দেখে মনে ভারি আনন্দ হলো। বলালাম, 'সকালে আমাদের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে এতো কি আলোচনা করলে তোমরা?'

'তোর বাবা জানতে চাইছিলেন সব কথা। আব্বু আর আমি আগেই ঠিক করেছিলাম, পাকড়াশী যে আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলো এ কথা তোদের বাড়িতে আলোচনা করবো না। শানু আপা এমনিতেই নার্ভাস টাইপের মানুষ। সামান্য কিছু হলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। যতটুকু বলেছি তাতেই মনে হলো মুচ্ছো যাবেন।' এই বলে নেলী খালা উঠে দাঁড়ালেন—'কাল সারা রাত ট্রেনে ঘুম হয় নি। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

নেলী খালা দরজার ছিটকিনি খুলতে যাবেন—এমন সময় বাবু বললো, 'আসল কথা-টাই তো জানা হলো না নেলী খালা?'

'কোন কথা?' একটু অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন নেলী খালা।

'জাহেদ মামার সঙ্গে তোমার বিয়ের খাওয়াটা কবে হবে সেটাই তো জানা হলো না।'

'তবে রে পাজি ছেলে!' ছুটে এসে বাবুর পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলেন নেলী খালা—'এসব হচ্ছে বড়োদের ব্যাপার।' রহস্যভরা গলায় তিনি বললেন, 'আমি কি একবা-রও জানতে চেয়েছি ললি টুনিরা মাসে তিন-চারটা করে চিঠি কাদের লেখে?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেলো বাবু। নেলী খালা ওর চিবুক নেড়ে আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

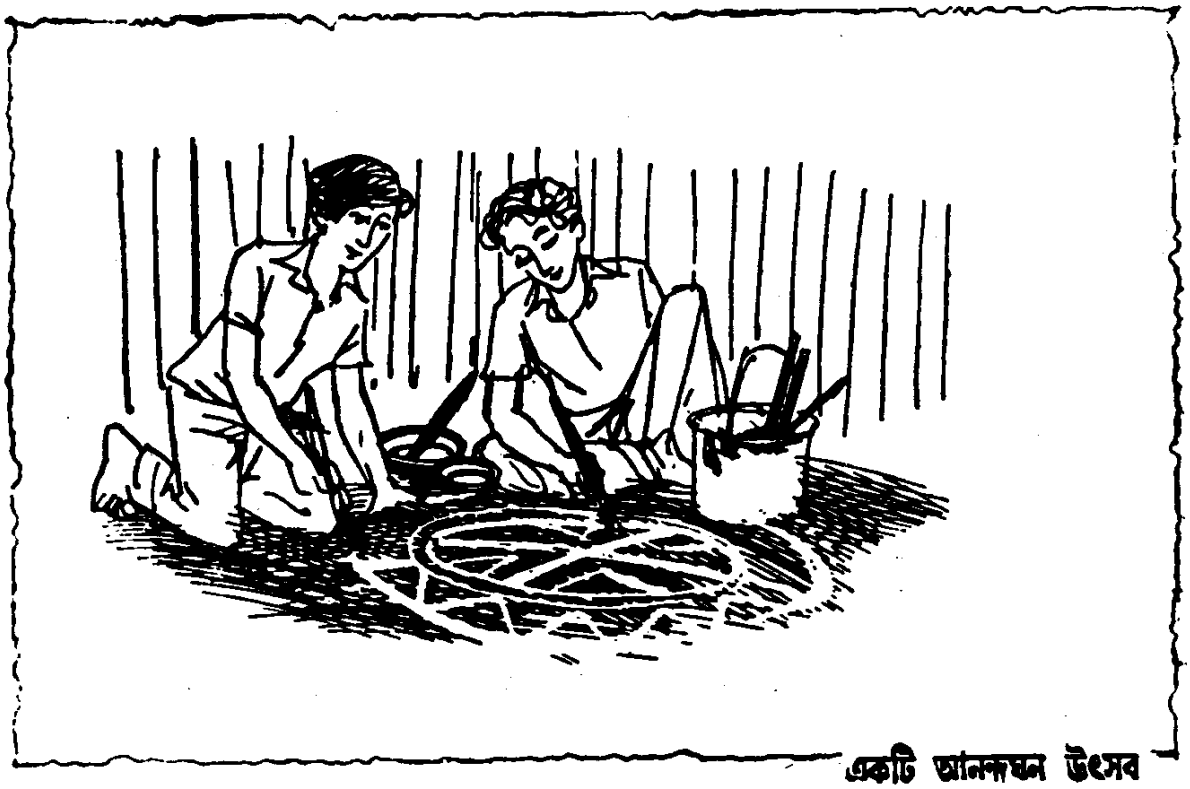

একটি আনন্দঘন উৎসব

নেলী খালার বিয়ে সম্পর্কে বড়োরা কি ভেবেছে সেটা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো পরদিন সকাল পর্যন্ত, যতক্ষণ না জাহেদ মামা এলেন। ললি একবার চিঠিতে লিখেছিলো, জাহেদ মামাকে দেখলে মনে হয় হলিউডের ওয়েস্টার্ন ছবির সুদর্শন নায়কটি বুঝি সিনেমার পর্দা থেকে নেমে এসেছেন। লম্বায় ছ' ফুটের কম হবেন না, গায়ের রঙ তামাটে, ধারালো চেহারা সব কিছু মিলিয়ে বাঙালি মনে হয় না। অথচ নেলী খালার চুলের ছাঁট আর পোশাক যতই ইউরোপিয়ান হোক না কেন, তাঁর চেহারা একেবারেই বাঙালি—অনেকটা দুর্গা প্রতিমার মতো। প্রথম এসেছিলেন বয়কাট চুল নিয়ে, মার বকুনি খেয়ে চুল ছাঁটা বন্ধ করাতে এখন ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। সেবার নানু যখন নুলিয়াছড়িতে চমৎকার এক রাতের পার্টিতে নেলী খালার সঙ্গে মেজর জাহেদ আহমেদের বিয়ের কথা বলেছিলেন, তা তখন শুধু আমরা কেন, উপস্থিত সবাই বলেছিলো দু'জনকে চমৎকার মানাবে।

জাহেদ মামার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো সকালে নাশতার টেবিলে। আটটার সময় আমি আর বাবু যখন তৈরী হয়ে নিচে গেছি, দেখি জাহেদ মামা বসে আছেন নেলী খালার পাশে। বাবা মা আর মেজো কাকা টেবিলের আরেক দিকে। নানু ঘড়ি ধরে সাতটায় ব্রেক-ফাস্ট করেন বলে তিনি সেখানে ছিলেন না। আমাদের দেখেই জাহেদ মামা হৈচৈ করে উঠ-লেন—'এই যে ক্ষুদে গোয়েন্দার দল, এতোক্ষণে বুঝি ঘুম ভাঙলো! যাবে নাকি পাথারিয়া?' বেড়াবার জন্য এমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও পাবে না।'

জাহেদ মামার কথা শুনে মা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি বাছা! নিজেরা কোথায় গিয়ে উঠবে তারই কিছু ঠিক হলো না, বলছো কি এসব?'

জাহেদ মামার হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের বাড়িতে তিনি আজই নতুন এসেছেন এবং

জায়গাটা নুলিয়াছড়ি নয়, তখনই নিজেকে সামলে নিলেন। লাজুক হেসে বললেন, 'না আপা, বলছিলাম কি, আমরা ওখানে গিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসে ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবো।'

'তাই বলো।' মা আশ্বস্ত হলেন—'আমি ভাবলাম কালই বুঝি তুমি ওদের বগলদাবা করে নিয়ে যাবে।'

নেলী খালা বললেন, 'তুমিও চলো না শানু আপা কদিন বেড়িয়ে আসবে। এতো করে নুলিয়াছড়ি যেতে বললাম, গেলে না।'

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমাকে তো আগেও বলেছি নেলী, এ বাড়ি ছেড়ে আমার নড়বার উপায় নেই।'

মার কথা শুনে নেলী আপা একটু অপ্রস্তুত হলেন। ভাইয়া চলে যাওয়ার পর মা এক-দিনের জন্যেও বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকেন নি। ওঁর ধারণা, ভাইয়া একদিন হঠাৎ করে বাড়ি আসবে আর তিনি সেই সময় বাড়িতে না থাকলে ও ভীষণ বিপদে পড়বে।

বাবা প্রসঙ্গ পাল্টে রহস্যভরা গলায় বললেন, 'জাহেদ একা শপিং করতে পারবে তো, না আমাকে সঙ্গে যেতে হবে?'

জাহেদ মামা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'না না, আমি একাই পারবো। আপনি মিছেমিছি ক্লাস নষ্ট করবেন কেন?'

বাবা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আজ না হয় ক্লাস পালালাম, কি বলো নেলী?'

নেলী খালা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আমি কি বলবো!'

ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেও আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম, 'আজ কি হবে বাবা?'

বাবার মুখে তখনো চাপা হাসি—'আজ তোমাদের নেলী খালার বিয়ে।'

অবাক হয়ে বাবু বললো, 'আজই! কেমন করে?'

'যেমন করে বিয়ে হয়! রাতে কাজী এসে বিয়ে পড়াবেন!'

'বাহ্। আমরা ভেবেছি নেলী খালার বিয়েতে কত মজা করবো! কার্ড ছাপা হবে, সবাই আসবে, হৈচৈ হবে। বরযাত্রীদের গেট আটকানো—আরও কত কি করবো বলে ঠিক করে রেখেছি—'

বাবুর কথা শুনে বোঝা গেলো এভাবে হুট করে নেলী খালার বিয়ে হয়ে যাবে, এটা ও মেনে নিতে পারছে না। আমাকে চিঠিতেও লিখেছিলো, নেলী খালার বিয়েতে নিশ্চয়ই ললি টুনিরা আসবে। ওদের নিয়ে কি সব মজা করবে নানারকম প্ল্যান এঁটেছিলো বাবু। এখন দেখা যাচ্ছে সবই ভেস্তে গেলো। বেচারার জন্য আমার ভারি মায়া হলো।

বাবা ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'জাহেদকে পরশু নতুন জায়গায় রিপোর্ট করতে হবে। তাছাড়া তোমাদের নানুও চান না বিয়ে নিয়ে এ সময়ে কোনো হৈচৈ হোক।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন, 'মামার একটামাত্র মেয়ে। আমার নিজেরই বা ছাই নেলী ছাড়া কে আছে! কি ভেবেছি আর কি হলো!'

নেলী খালা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি যখন কোথাও যাবে না শানু আপা, তখন আমরাই তোমার এখানে পরের বার এসে বড়ো করে একটা পার্টি দেবো। তখন তুমি যা খুশি কোরো।'

মেজো কাকা এতক্ষণ পর বললেন, 'নুলিয়াছড়িতে কি হয়েছে সব ভুলে যাও নেলী। তোমাকেও বলছি জাহেদ, পাকড়াশীকে তোমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছো। ও এখানে কিছুই করতে পারবে না। আজ যতটুকু আনন্দ করা যায় আমরা তাই করবো। শানু ভাবী, তুমি

এক্ষুণি বাজারের ফর্দ তৈরি করো। জাহেদ, তোমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব থাকলে আসতে বলো। ছেলেরা ঘর সাজাবে।'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'সবাইকে কাজে লাগালি মেজো, আমি কি করবো?'

মেজো কাকা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি আপাতত আমার সঙ্গে বাজারে যাবে, তার-পর ভাবীকে রান্নাঘরে সাহায্য করবে। আমারও একটু শপিং আছে।'

বাবা রান্না করবেন শুনে মা ফিক করে হেসে ফেললেন—'তোমার ভাই যদি আমার সঙ্গে রান্নাঘরে থাকে, তাহলে আজ আর কাউকে কিছু খেতে হবে না জামি।'

'কেন, আমি কি করেছি!' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বাবা।

'মনে নেই বুঝি!' মুখ টিপে হেসে মা বললেন, 'বিয়ের পর কোত্থেকে ইংরেজি এক রান্নার বই এনে কি উদ্‌ভুটে সব রান্না করতে! পাড়াসুদ্ধো লোক টের পেতো! বাড়ির কেউ তো খেতোই না, চাকররা পর্যন্ত বাহানা করে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না।'

বাবা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওসব কথা এখনো বুঝি তোমার মনে আছে! সবই যখন বললে, তখন তোমার মামা আমার রান্না খেয়ে কি বলেছিলেন সেটা বলছো না কেন?'

'আব্বু বুঝি আপনার রান্না খুব পছন্দ করতেন?' জানতে চাইলেন নেলী খালা।

'করবেন না কেন?' মা এমনভাবে বললেন যেন নানু মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। 'দুনিয়াতে এমন কোনো অখাদ্য রান্না আছে—তোর আব্বু সোনা হেন মুখ করে খান নি! কোরিয়ায় যখন ছিলেন তখন শুনেছি—মা গো, সাপের স্যুপ আর বানরের মাথার মগজ ভাজি খেয়েছেন।' এই বলে ঘেন্নায় শিউরে উঠলেন মা।

মেজো কাকা বললেন, 'থাক, আর বলতে হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না ভাবী। ভাইয়াকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

মা টেবিল ছেড়ে উঠলেন—'সবাই তাহলে যে যার কাজে লেগে যাও। হাতে সময় একে-বারেই নেই।'

জাহেদ মামাও উঠে পড়লেন—'আমি তাহলে বেরুচ্ছি।'

'দুপুরের আগে ফিরে এসো কিন্তু।' এই বলে মা রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

আমি আর বাবু এক লাফে তিনটি করে সিঁড়ি টপকে প্রথমে এলাম চিলেকোঠার ঘরে। দু'জনে মিলে ঠিক করলাম কিভাবে ঘর সাজাবো।

আমি বললাম, 'নেলী খালাদের ঘরটা ফুল দিয়ে সাজাবো। মেঝেতে কার্পেট সরিয়ে আল্পনা দেবো।'

বাবু বললো, 'এতো ফুল পাবে কোথায়?'

'বাগানে যা আছে সব তুলবো। দরকার হলে কিনবো।'

'তোমাদের এখানে রঙিন রাংতা পাওয়া যায়?'

'যায় বৈকি! একবার আমরা স্কুলের নাটকের জন্য কিনেছিলাম। শাঁখারি বাজারে অনেক দোকান আছে।'

'আমাদের ইনটেরিয়ার ডেকোরেশন ক্লাসে ঝালর বানানো শিখিয়েছিলো। রঙিন রাংতা কেটে ঝালর আর ফুল বানালে দারুণ লাগবে!'

এমন সময় আমাদের দু'জনকে চমকে দিয়ে নেলী খালা ঘরে ঢুকলেন। যেন ষড়যন্ত্র করছেন—এমনভাবে চাপা গলায় বললেন, 'জাহেদ তোমাদের জন্য পাঁচ শ' টাকা দিয়ে গেছে। বলেছে গেট ধরতে পারো নি বলে যেন মন খারাপ না করো।'

একশ' টাকার পাঁচখানা নোট বাবুর পকেটে গুঁজে দিয়ে নেলী খালা চলে গেলেন।

উত্তেজনায় বাবুর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো—'এ টাকাটা আমরা ঘর সাজাবার কাজে খরচ করতে পারি।'

একসঙ্গে হঠাৎ এতোগুলো টাকা পেয়ে আমিও কম উত্তেজিত হই নি। বললাম, 'ঘর সাজাবার জন্য এতো টাকা লাগবে না। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। যা বাঁচবে সেগুলো দিয়ে আমরা নেলী খালাদের জন্য উপহার কিনবো।'

'দারুণ বলেছো আবির।' এই বলে বাবু ফুর্তির চোটে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

ঝটপট কাপড় বদলে দু'জন মাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম। শাঁখারি বাজারের মঞ্চমায়া থেকে বাবু নানা রঙের দুই দিস্তা রাংতা আর জরির ফিতা কিনলো। কোতোয়ালি ফাঁড়ির ফুলওয়ালাদের কাছে গেলাম ফুলের অর্ডার দেয়ার জন্যে। ওরা বিকেলের পর থেকে ফুল বিক্রি করে। চারজন মিলে চল্লিশটা রজনীগন্ধার স্টিক আর দুই ডজন গোলাপ দিতে পারবে বলে জানালো। নেবে এক শ' পঁচিশ টাকা।

বাবু বললো, 'আরো বেশি পেলে ভালো হতো।'

আমি বললাম, 'আমাদের বাগানে দেখেছো কত রজনীগন্ধা! এ বছর অনেক হয়েছে।'

বাবু জিজ্ঞেস করলো, 'ফুল কেনার টাকা বাদে হাতে কত থাকছে?'

'জাহেদ মামার পাঁচ শ' টাকার ভেতর তিন শ'র মতো থাকবে। আমি আরো পঞ্চাশ টাকা দিতে পারবো।'

'আমার কাছে আছে দু শ' টাকা। নেলী খালাদের জন্য কি উপহার কিনবে ঠিক করো।'

'আমাকে একবার নেলী খালা বলেছিলেন তিনি সবচে বেশি খুশি হন বই উপাহার পেলে।'

'কি বই কিনবে?'

'আগে বাংলাবাজার চলো। দোকানে গিয়ে দেখি কি বই কেনা যায়।'

অন্য সময় হলে হেঁটেই যেতাম। সেদিন তাড়া ছিলো বলে আট আনা দিয়ে রিকশা নিলাম।

বাবু বললো, 'আগে যদি জানতাম, দারুণ সব বই আনতে পারতাম।'

'এখানেও অনের ভালো বই পাওয়া যায়।'

'তুমি তো জানো না, ওখানে প্রত্যেক বছর বইয়ের দোকানে সেল-এর সময় পানির দামে বিরাট বিরাট সেট বিক্রি হয়।'

বাংলা বাজারে মাওলা ব্রাদার্স-এর সামনে এসে রিকশা বিদায় করলাম। একদিকে ইণ্ডিয়ান, আরেক দিকে আমাদের দেশের বই দেয়ালজোড়া তাক ভর্তি সাজানো। বইয়ের দোকানে এলে আমার হুঁশ থাকে না। বই দেখে অনায়াসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। বাবুকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি পছন্দ করো।'

বাবু বেশি সময় নিলো না। এগারো খণ্ডের শরৎ রচনাবলী পছন্দ করলো ও। চকলেট রঙের রেক্সিনে বাঁধানো সোনার হরফে লেখা প্রচ্ছদ। উপহার দেয়ার জন্য চমৎকার পছন্দ। সাড়ে তিন শ' টাকা দিয়ে পুরো শরৎ রচনাবলী কিনে যখন বাড়ি ফিরলাম ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। কি এনেছি কাউকে টের পেতে দিলাম না।

জিনিসপত্র চিলেকোঠার ঘরে রেখে এসে নেলী খালাকে বললাম, 'সন্ধে পর্যন্ত তোমার ঘর আমাদের দখলে থাকবে। এর মধ্যে ভেতরে আসতে পারবে না। তোমার দরকারি জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে মার পাশের ঘরে চলে যাও।'

নেলী খালা কাঁধ নাচিয়ে শ্রাগ করে তাঁর ছোট সুটকেসটা নিয়ে নিচে চলে গেলেন।

আমরা বসলাম, সাদা রেডিমিকসড পেইন্ট দিয়ে আল্পনা আঁকতে। ছবিতে আমার হাত যে স্কুলে সবার চেয়ে ভালো, এ কথা ড্রইং টীচার অনেকবার বলেছেন। আল্পনা আঁকতে গিয়ে দেখলাম বাবুর হাতও কম পাকা নয়।

নেলী খালার ঘর সাজাতে পুরো পাঁচ ঘণ্টা লাগলো। এর ভেতর এক ফাঁকে আমি ইসলামপুর থেকে ফুল নিয়ে এলাম। ফুল আনতে গিয়ে দেখি ফুলওয়ালার ডালার ওপর রজনীগন্ধার মস্তো মোটা দুটো মালা। বাবুকে অবাক করে দেয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মালা দুটো কিনলাম। ততক্ষণে বাবু রঙিন রাংতার ফুল আর ঝালর দিয়ে দেয়াল সাজিয়ে ফেলেছে। বললাম, 'নেলী খালার বিয়ে যতটা সাদামাটা হবে ভেবেছিলাম, ততটা কিন্তু হচ্ছে না।'

বাবু ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে বললো, 'তবু যদি নেলী খালাকে বউ সাজানো যেতো! জেঠিমা জোর করে হলুদ মাখিয়েছেন বটে, নেলী খালা বলেছেন মুখে ওসব ফোঁটা-টোটা দিতে পারবেন না।'

আমি মালা দুটো বের করে বললাম, 'এটা পরালে চলবে তো বাবু?'

মালা দেখে বাবু আনন্দে আটখানা হলো—'কি দারুণ জিনিস এনেছো আবির! এতো সুন্দর মালা আমি ভাবতেও পারি নি এখানে পাবে!'

'এখন কাউকে দেখাবো না। সময় এলে বের করবো।' এই বলে আমিও মালা গাঁথতে বসলাম। একটু পরে ক্ষেন্তির মা এসে চা খেতে ডাকলো। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে আমরা ঘর সাজাচ্ছিলাম। সবশেষে নেলী খালার খাটটা রজনীগন্ধার মালা দিয়ে সাজিয়ে যখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে দেখলাম, মনে হলো রূপকথার কোনো ছবি। তার-পর উপহারের প্যাকেট এনে টেবিলে রেখে পরিতৃপ্ত মনে চা খেতে নামলাম।

খাবার টেবিলে শুধু নেলী খালা আর মেজো কাকাকে দেখলাম। স্ক্যাটরা শুয়ে আছে নেলী খালার পায়ের কাছে। দু'দিন ধরে বেচারা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নুলিয়াছড়ির অতবড়ো বাড়ি আর লনের মজা কি আমাদের রূপলাল লেনের পুরনো বাড়ির এক চিলতে উঠোনে পাবে!

মা যে রান্নাঘরে ব্যস্ত, খাবার ঘর থেকেই গন্ধে টের পাচ্ছিলাম। মেজো কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কোথায়?'

'কাজীর অফিসে গেছে।' এই বলে মেজো কাকা আড়চোখে নেলী খালাকে দেখলেন।

নেলী খালা বললেন, 'আবির, বাবু, তোমাদের ঘরে আমি দুটো প্যাকেট রেখে এসেছি। কিছুক্ষণ আগে তোমাদের জাহেদ মামা এসে দিয়ে গেছেন।'

'আর জাহেদ মামা বলাচ্ছো কেন নেলী! একটু পরেই তো জাহেদ খালু হয়ে যাবে। কি রে, তোরা খালু ডাকবি তো?'

নেলী খালাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম, 'আমরা বিয়ের পরও মামা ডাকবো। খালু কেমন আলু আলু শোনায়।'

নেলী খালা ফিক করে হেসে ফেললেন। মেজো কাকা গম্ভীর হওয়ার ভান করলেন—'তাহলে নেলী মামী ডেকো।'

এবার নেলী খালা মুখ খুললেন, 'জামি ভাই, আপনি সেই দুপুর থেকে আমার পেছনে লেগেছেন। আমাকে আর জাহেদকে ওরা যা খুশি ডাকবে।'

মেজো কাকা কি যেন বলতে যাবেন, এমন সময় রান্নাঘর থেকে মা ডাকলেন, 'জামি, একবার শুনে যাও তো!'

মেজো কাকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভেতরে গেলেন। এই ফাঁকে নেলী খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোন শাড়িটা পরবে ঠিক করেছো?'

নেলী খালা একটু লজ্জা পেলেন— 'জাহেদ একটা জামদানি শাড়ি কিনেছে। শাড়ি অবশ্য সাত-আটটা কিনেছে। বেনারসিও আছে। আমার পছন্দ জামদানি।' এই বলে তিনি চেয়ার থেকে উঠলেন। বললেন, 'শানু আপা একা কুলোতে পারছেন না। ওঁকে একটু সাহায্য করা দরকার।'

আমি বললাম, 'তোমাকে মা আজ মোটেই রান্নাঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

নেলী খালা মৃদু হেসে চলে গেলেন। বাবু বললো, 'ড্রইং রুমটা এখনো গোছানো হয় নি। জলদি করো।'

কথা বলতে বলতে চা এমনিতে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। এক চুমুকে শেষ করে বললাম, 'তুমি ওপরের ঘর থেকে চার-পাঁচটা রজনীগন্ধার স্টিক আর কটা গোলাপ নিয়ে এসো ফুলদানির জন্য।'

মার হাতে-বোনা কুশন কভারগুলো বের করে কুশনগুলোকে পরালাম। বাইরের বারান্দায় আগেই আল্পনা এঁকেছিলাম। দুটো ফুলদানিতে গোলাপ আর রজনীগন্ধা সাজালাম। সন্ধের সময় বসার ঘরের লাইটগুলো সব জ্বালিয়ে দিলাম। ক্যাসেটে চাপালাম বিসমিল্লা খাঁর সানাই। সারা ঘর উৎসবের আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

ড্রইং রুম সাজানো শেষ করেই আমরা আমাদের চিলেকোঠার ঘরে গেলাম। বিছানার ওপর দেখি আমাদের দু'জনের নাম লেখা দুটো প্যাকেট। খুলতেই বেরুলো লেভিস-এর জিনস আর জ্যাকেট। বাবুরটা নীল, আমারটা হালকা শ্যাওলা সবুজ। সেজেগুজে সাড়ে ছটায় নিচে নামলাম।

সাতটার দিকে জাহেদ মামা এলেন। অবাক হয়ে দেখি পেছন পেছন দুটো বড়ো মিষ্টির বাক্স হাতে ঘরে ঢুকলেন নুলিয়াছড়ির চিল্লানোরাস মুৎসুদ্দী—থুড়ি, কর্নেল তানভীর হোসেন চৌধুরী। বাবু ওঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—'আপনি কবে ঢাকা এলেন তানভীর আঙ্কল?'

'জাহেদের সঙ্গেই এসেছি।' মৃদু হেসে কর্নেল বললেন, 'তোমরা ললি টুনিকে ফেলে বুঝি নেলী খালা আর জাহেদ মামার বিয়েতে মজা করছো। জানতে পারলে ওরা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে না।'

ওঁর কথা শুনে বাবা, মেজো কাকা আর নানু বেরিয়ে এলেন। জাহেদ মামা পরেছেন নীলচে কালো স্যুট, শার্টের রঙ হালকা নীল, টাই গাঢ় নীলের ভেতর হালকা নীলের ফোঁটা। দেখাচ্ছিলো ঠিক রবার্ট রেডফোর্ডের মতো। মুখে লজ্জা মেশানো মৃদু হাসি। জাহেদ মামার বাবা-মা কেউ নেই। আছেন এক ভাই, থাকেন বিলেতে। কর্নেল চৌধুরী এসেছেন ওঁর মুরুব্বি হয়ে।

বাবা এগিয়ে এসে কর্নেল চৌধুরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'ছেলেদের কাছে আপনার কথা এতো শুনেছি যে বলার নয়।'

মেজো কাকা মৃদু হেসে বললেন, 'আমেরিকায় বসে আমাকেও শুনতে হয়েছে।'

কর্নেল চৌধুরী হা হা করে হাসলেন—'এরা না থাকলে আমাদের আরো বহুদিন অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হতো।' এই বলে আমার আর বাবুর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

এমন সময় দরজার কাছে, 'আসসালামু ওয়ালাইকুম' শুনে তাকিয়ে দেখি একজন কালো দাড়িওয়ালা, জোব্বা পরা, মোটাসোটা আর পাশে বিশাল এক খাতা বগলে ছাগুলে

দাড়িওয়ালা রোগা লিকপিকে আরেক জন। দেখামাত্র চিনে ফেলালাম কাজী আর তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে। বাবা সালামের জবাব দিয়ে 'আসুন কাজী সাহেব,' বলে তাঁদের সোফায় নিয়ে বসালেন।

কাজী সাহেব আয়েশ করে বসে বললেন, 'আমি তো বাসা টোকাই ফাইছিলাম না। সামিয়ানা নাই, গেট নাই, মানুষজন নাই, রাস্তায় জিজ্ঞাস কইরলাম বিয়া বাড়ি কোনটা, কেউ কইতে ফাইরলো না। শ্যাষে ঠিকানা কওয়াতে এই বাড়ি দেখাই দিলো।'

মেজো কাকা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'শামিয়ানা, গেট না থাকলেও খাসির বিরিয়ানী, রোস্ট, রেজালা সবই আছে।'

'হা হা হা, তাতো থাইকবই। না হইলে আর বিয়া-শাদি কেন।' বলে কাজী সাহেব এমনভাবে হাসলেন যেন মেজো কাকা দারুণ এক হাসির কথা বলেছেন। তারপর ঘড়ি দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তা সময় ত হই গেছে। নওশা মিয়া কখন আইসবেন?'

মেজো কাকা জাহেদ মামাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই তো নওশা, আপনার বুঝি পছন্দ হয় নি?'

'হা হা হা, কি যে কন ভাইসাব, পছন্দ না হইব ক্যান! ইনি ত মালুম হয় বাদশাজাদা, সিনিমা, থিটার করেন নি?'

'না, ইনি আর্মির মেজর।' হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বললেন মেজো কাকা।

যে জন্য তিনি গম্ভীর হলেন তার ফল পাওয়া গেলো সঙ্গে সঙ্গে। কাজী সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। ঢোক গিলে বললেন, 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্, মাশাল্লাহ্, মাশাল্লাহ্! তা আমরা কি আরো দেরি কইরবো?'

বাবা বললেন, 'না, দেরি কিসের। আগে শরবতটুকু খান।'

জাহেদ মামারা আসার সঙ্গে সঙ্গে বড়িবি পেশতার শরবত আর মিষ্টি রেখে গিয়েছিলো টেবিলে। কাজী সাহেব আর তার এ্যাসিসটেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ঢকঢক করে শব্দ করে শরবত খেয়ে দুটো করে রাজভোগ আর ছানার আমৃতি খেলেন। ঢেকুর তুলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললেন দু'জনেই। তারপর মোটা খাতা খুলে কাজী সাহেব জাহেদ মামা আর নেলী খালার নাম, পিতার নাম এসব লিখলেন। মেজো কাকা হলেন নেলী খালার উকিল আর কর্নেল চৌধুরী আর বাবা হলেন সাক্ষী! কাজী সাহেবের শেখানো কথাগুলো ভেতরে গিয়ে নেলী খালাকে বলে তাঁর মত আনলেন। এরপর শুরু হলো মোনাজাত। বেশি টাকা পাওয়ার আশায় অনেকক্ষণ ধরে অনেক ভালো ভালো কথা বলে মোনাজাত করলেন কাজী সাহেব। ছাগুলে দাড়ি এ্যাসিসটেন্ট ঘন ঘন এবং জোরে জোরে 'আমিন, আমিন' বলছিলেন।

মোনাজাত শেষ হওয়ার পর কাজী সাহেব বললেন, 'আমাদের আরো দুইটা শাদি পড়ানো বাকি আছে।'

মেজো কাকা বললেন, 'আপনারা দু'জন তাহলে এখনই খেয়ে নিন। আবির, বাবু যাও, টেবিলে এদের খাওয়া দিতে বলো।'

আমি আর বাবু টেবিলে কাজী আর লিকপিকে এ্যাসিসটেন্টকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম। দু'জনে বড়ো দুটো মুরগির রোস্ট, চার টুকরো বড়ো রুই মাছের পেটি, দু'বাটি রেজালা আর কিমা মটর খেলেন প্রচুর বিরিয়ানীর সঙ্গে। খেতে খেতে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। আধ ঘণ্টা পর হেউ হেউ ঢেকুর তুলতে তুলতে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে উঠলেন। মেজো কাকা তাদের এগিয়ে দিয়ে এলেন। বাবু মুখ টিপে হেসে বললো, 'কাজী সাহেবরা মাত্র ওয়ান থার্ড ডিনার করলেন। মনে রেখো আরো দু' বাড়ি এখনো বাকি আছে।'

বাবুর কথা শুনে আমার হাসি সামলানো দায় হলো। মেজো কাকা ড্রইং রুম থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'আবির, বাবু, তোমাদের নেলী খালাকে নিয়ে এসো, কাজী সাহেবরা বিদায় হয়েছেন।'

নিচের তলার গেস্ট রুমে ছিলেন নেলী খালা। পরেছেন হালকা বেগুনি জামদানি, ভেতরে সোনালি জরি আর সাদা সুতোর নকশা। অলঙ্কার পরা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, তবু মার জন্য হাতে দুটো সোনার বালা, গলায় রুবির লকেট, কানে ছোট্ট দুটো রুবির ফুল পরেছেন, তাতেই মনে হচ্ছিলো পরির মতো। নতুন বউদের মতো মুখে কোনো ফোঁটা নেই, শুধু কপালে শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা টিপ—একদম অন্যরকম নেলী খালা।

মেজো কাকার কথা শুনে নেলী খালা ঘর থেকে যেই বেরুতে যাবেন মা চাপা গলায় বললেন, 'নেলী, মাথায় ঘোমটা দাও।'

নেলী খালা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'বাইরের কেউ তো নেই, সবই তো ঘরের!'

'আহ্, যা বলছি তাই করো।' এই বলে মা নেলী খালার মাথার আঁচল তুলে কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।

মেজো কাকা বললেন, 'বাহ্, চমৎকার লাগছে তো! জাহেদের পাশে বসো। আমি ছবি তুলবো।'

হঠাৎ বাবু—'বাবা, এক মিনিট অপেক্ষা করো।' বলে একছুটে ওপরে গেলো। অন্য সবাই একটু অবাক হলেও আমি মুখ টিপে হাসলাম।

বাবু সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে এলো, হাতে রজনীগন্ধার বিশাল দুই মালা। একটা আমাকে দিয়ে বললো, 'চলো, পরিয়ে দেবো।'

আমরা দু'জন নেলী খালা আর জাহেদ মামাকে মালা পরালাম। মেজো কাকা ছবি তুললেন। লজ্জায় লাল হওয়া ওঁদের দু'জনকে অপরূপ সুন্দর লাগছিলো। মা পর্যন্ত হাসিমুখে বললেন, 'এতোক্ষণে কিছুটা বর-কনে মনে হচ্ছে।'

জাহেদ মামা সঙ্গে সঙ্গে মালা খুলে ফেললেন। তাঁর দেখাদেখি নেলী খালাও। মেজো কাকা বললেন, 'ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই নেলী। ছবি তুলে ফেলেছি।'

মা বললেন, 'তোমরা খাবার টেবিলে এসো। খেয়েদেয়ে গল্প করা যাবে।'

খেতে বসে টের পেলাম কাজীরা কেন এতো বেশি বেশি খেয়েছিলেন। মার রান্না হয়েছিলো অপূর্ব। সবার প্রশংসার চোটে মা অস্থির হয়ে গেলেন। কর্নেল চৌধুরী যে এতো মজার গল্প করতে পারেন সে আর বলার নয়। রাত একটা বাজলো গল্পের আসর শেষ হতে। তবে আমাকে আর বাবুকে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। মেজো কাকা বললেন, 'এবার বড়োদের গল্প। তোমরা তোমাদের ঘরে যাও ঘুমোতে।'

ওপরে এলাম বটে, ঘুম কি আর আসে! বাবু বললো, 'চলো, ললি, টুনিকে নেলী খালার বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি লিখি।'

'আলাদা আলাদা লিখবে, না একসঙ্গে?' জানতে চাইলাম আমি।

'একসঙ্গে, একসঙ্গে!' চেঁচিয়ে উঠলো বাবু। 'দারুণ এক সারপ্রাইজ দেয়া হবে। আমি যে ঢাকা এসেছি এ খবরও ওরা জানে না।'

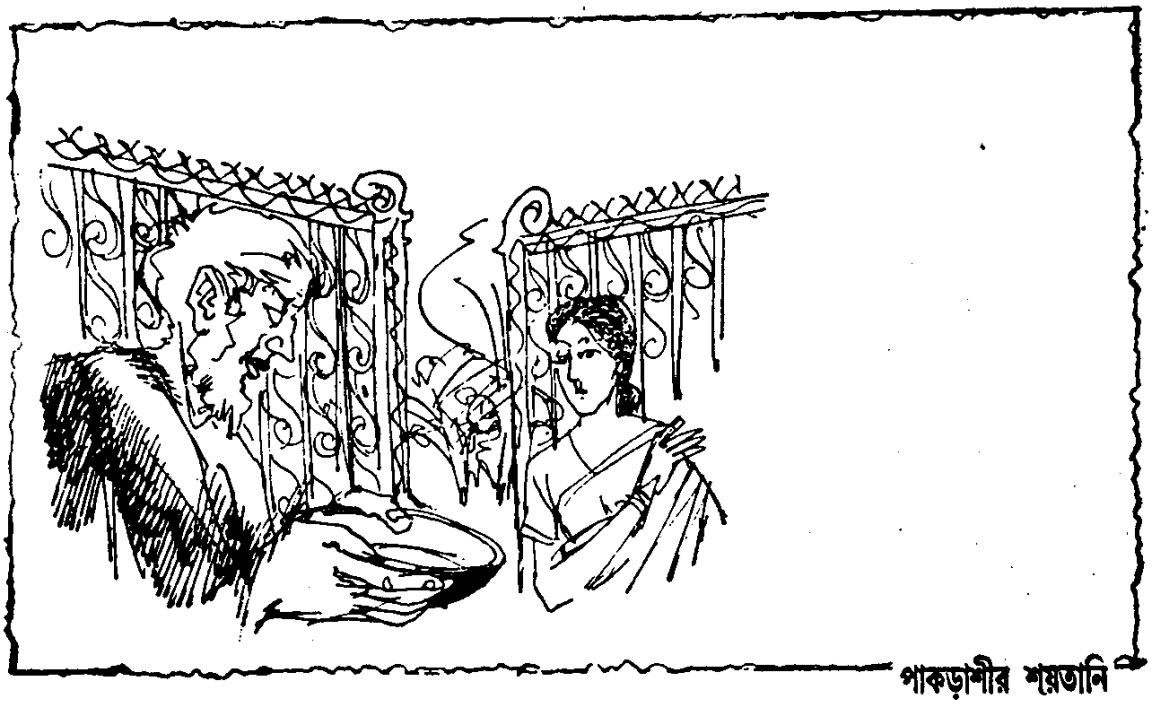

পাকড়াশীর শয়তানি

ললি, টুনিকে চিঠি লেখা শেষ করে আমরা ঘুমিয়েছিলাম দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজার ঘণ্টা শোনার পর। উঠতেও তাই দেরি হয়েছিলো। তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে নিচে এসে দেখি সবাই ড্রইং রুমে বসে গম্ভীর হয়ে কি যেন আলোচনা করছেন। আমাদের দেখে মা বললেন, 'টেবিলে নাশতা রাখা আছে। খেয়ে ঘরে যাও। আজ কোথাও বেরোবে না।'

মার কথা বলার ধরন দেখে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। আমি আর বাবু চুপচাপ নাশতা শেষ করে চিলেকোঠার ঘরে এলাম। ভুরু কুঁচকে বাবু প্রশ্ন করলো, 'ব্যাপার কি আবির! আজ সবাই মিলে হৈচৈ করবো ভেবেছিলাম—কি হয়েছে বলো তো!'

'কিছু একটা ঘটেছে এটুকুই বলতে পারি। নেলী খালা যদি আসতেন জানা যেতো।' এর বেশি আমি কিছু বলতে পারলাম না।

'এক কাজ করি চলো।' বাবুর মাথায় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খেললো—'বাইরের বাগান থেকে জানালা দিয়ে নেলী খালাকে ইশারা করে আসতে বলি।'

বাবুর কথা আমারও পছন্দ হলো। দু'জনে চুপি চুপি নিচে নেমে বাগান দিয়ে ঘুরে বসার ঘরের জানালার কাছে এলাম। নেলী খালা জায়গা বদল করে বসেছেন বলে তাঁকে দেখা যাচ্ছিলো পাশ থেকে। মাথা একটু না ঘোরালে তিনি আমাদের দেখতে পাবেন না। একটু আগেই দেখেছিলাম তিনি জানালার দিকে মুখ করে বসেছেন। জানালার আর একটু কাছে আসতেই মেজো কাকার গলা শুনলাম।

আড়ি পেতে বড়োদের কথা শোনা উচিত নয় জেনেও আমরা নিজেদের সামলাতে পারলাম না, কারণ মেজো কাকাকে পষ্ট বলতে শুনলাম, 'আবির, বাবুকে এসব বুঝতে দিও না ভাবী। ওদের কিছু হবে না। ওরা যেমন ছিলো তেমনই থাকুক।'

মা শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি জানো না জামি, ওই শয়তানটা পারে না হেন কাজ দুনিয়াতে নেই। বাছাদের যদি ধরে নিয়ে গুম করে রাখে, যদি কোনো ক্ষতি করে—না, না, ওরা কদিন সাবধানে থাকুক।'

নানু বললেন, 'আমি আবারও বলছি থানায় একটি ডায়রি করে রাখো।'

'লাভ কি আব্বু। নেলী খালা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'পুলিশের সঙ্গে ওর কেমন দহরম মহরম, নুলিয়াছড়িতে টের পাও নি!'

'সব পুলিশ খারাপ, এটা ভাবা তোমার উচিত নয়।'

'খুঁজলে হয়তো লাখে একটা ভালো পুলিশ পাওয়া যাবে। তবে ওদের ভরসায় থাকলে আমাদের চলবে না।'

জাহেদ মামা বললেন, 'আমরা তো কালই চলে যাচ্ছি আব্বু। আমি বরং আই বি ডিপার্ট মেণ্টকে জানিয়ে রাখি পুরো ব্যাপারটা।'

'এটা তুমি মন্দ বলো নি। পুলিশের চেয়ে আই বি এসব কাজে ভালো হবে।' নানুর প্রশংসায় জাহেদ মামা একটু লাল হলেন।

বড়োদের কথা শুনে মনে হলো পাকড়াশীর তরফ থেকে সম্ভবত কোনো বিপদের আশঙ্কা করছেন। জানালার কাছে বেশিক্ষণ এভাবে থাকাটা উচিত হবে না ভেবে বাবুকে চাপা গলায় বললাম, 'ওপরে চলো।'

কোনো রকম শব্দ না করে চিলেকোঠার ঘরে এসে দু'জনে মিলে জট খুলতে বসলাম। বাবু প্রথমে জানতে চাইলো, 'তোমার কি মনে হচ্ছে আবির?'

আমার ধারণার কথা বাবুকে বললাম, 'পাকড়াশী আবার বোধ হয় কোনো থ্রেট করেছে।'

বাবু মাথা নেড়ে সায় জানালো—'আগের চেয়ে সিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

'জাহেদ মামা তো বললেন, আই বি ডিপার্টমেণ্টকে জানাবেন।'

'যাই বলো না কেন, আই বি-ও চালায় পুলিশের লোকেরাই।'

'তুমি বলতে চাইছো আই বি-কে ভরসা করা যায় না?'

'ঠিক তাই। যা করার আমাদের করতে হবে।'

'আমরা কি করবো! নেলী খালারা তো কালই চলে যাচ্ছেন।'

একটু থেমে আমি বললাম, 'আমার মনে হয় পাকড়াশী শুধু ভয়ই দেখাচ্ছে। নুলিয়াছড়ির রাজত্ব ছেড়ে ও পাথারিয়া পর্যন্ত নেলী খালাকে ধাওয়া করবে—এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

'পাকড়াশীকে মনে হচ্ছে তুই আণ্ডার এস্টিমেট করছিস।' দরজার কাছে নেলী খালার গলা শুনে দু'জন একসঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম।

নেলী খালা ঘরে ঢুকে খাটের ওপর বসলেন! সাদা একটা খাম থেকে ভাঁজ করা লাল কাগজের চিঠি বের করে বললেন, 'পড়ে দেখ।'

আমি আর বাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লাম চিঠিটার ওপর। বাংলা টাইপ করা চিঠি—

'মিস চৌধুরী, আপনার বিয়েতে অভিনন্দন জানাতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমার লোকজন ছায়ার মতো আপনাদের অনুসরণ করছে। ঢাকায় আপনাদের সঙ্গে ক্ষুদে বিচ্ছু দুটোকে দেখা গেছে। বিপদ কখন কার ওপর আসে কিছুই বলা যায় না। আপনার জন্য সারাক্ষণ আমার দুঃখ হয়। এত অল্প বয়সে প্রিয়জনদের হারানো কিম্বা নিজেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া— কোনোটাই কম দুঃখের নয়। তবে এর কোনোটাই আমার দুঃখের চেয়ে বেশি গুরুতর নয়। ইতি—নিপা'

বাবু অবাক হয়ে জানতে চাইলো—'নিপা কার নাম?'

নেলী খালা কাষ্ঠ হাসলেন— 'নিশ্চয়ই আমার কোনো বান্ধবী নয়! নিপা মানে নিকুঞ্জ পাকড়াশী।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আগে ভয় দেখাতো আমাকে। এবার আমার প্রিয়জনদের কথা লিখেছে।'

'আমাদের জন্যে তুমি ভেবো না।' নেলী খালাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'পাকড়াশীকে আমরা ঠিকই জব্দ করবো।'

নেলী খালা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'জানি তোরা খুব সাহসী, তোদের জন্য আমার গর্ব হয়। তবে পাকড়াশী খুবই বাজে ধরনের লোক। ওর ক্ষমতাও কম নয়।'

বাবু বললো, 'নুলিয়াছড়িতেই ও আমাদের কিছু করতে পারলো না, ঢাকায় কি করবে?'

নেলী খালা শুকনো হেসে বললেন, 'দু'বার আমার ওপর এ্যাটেম্পট নিয়েছে। স্ক্যাটরা অল্পের জন্য বেঁচেছে। ওকে আণ্ডার এস্টিমেট করা উচিত হবে না।'

'চিঠিটা কোথায় পেয়েছেন নেলী খালা?' জানতে চাইলো বাবু।

'লেটার বক্সে।' 'সকালে আমিই প্রথম লেটার বক্স খুলেছিলাম। '

'তোমরা তাহলে কি ঠিক করেছো?' যেন কিছুই জানি না—এভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

'ভালোয় ভালোয় পাথারিয়া গিয়ে গুছিয়ে বসতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। জাহেদ বলেছে, কর্নেল তানভীরের সঙ্গে কথা বলবে। ওদের দৌড় কদ্দুর আমার জানা আছে। তোরা সাবধানে থাকিস।'

'তোমরা সত্যি সত্যি কাল চলে যাবে?'

ম্লান হাসলেন নেলী খালা—'না গিয়ে জাহেদের উপায় নেই। আব্বুও চান তাড়াতাড়ি পাথারিয়া যেতে। ওঁর ধারণা পাথারিয়াতে পাকড়াশী আমাদের নাগাল পাবে না।' এই বলে তিনি খাট থেকে উঠলেন।

'তোমরা কি আজ কোথাও বেরুচ্ছো?' জানতে চাইলাম আমি।

'শানু আপার হুকুম, আজ কেউ বাড়ি থেকে বেরুবে না।' মৃদু হেসে চলে গেলেন নেলী খালা।

বাইরে যেতে পারবো না শুনে মন আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। বাবুকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত চাইনীজ চেকার খেললাম। বিকেলে ছাদে বসে নেলী খালাদের নিয়ে মনোপলি খেলতে বসেছি, বড়িবি এসে বললো, 'সাব ডাকছেন মিসিবাবাকে।'

'আবার কি হলো?' বলে নেলী খালা নিচে নেমে গেলেন। আমরা হাত গুটিয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করলাম। জাহেদ মামা বললেন, 'তোমরা শুনেছো বোধ হয় সকালে কি ঘটেছে?

বাবু আড়চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'নেলী খালা পাকড়াশীর চিঠি পেয়েছেন।'

'দেখেছো কি লিখেছে?'

'দেখেছি। এ ধরনের চিঠি তো নেলী খালা আগেও পেয়েছেন।'

'তা পেয়েছে।' জাহেদ মামা চিন্তিত গলায় বললেন, 'আগের চিঠিগুলোকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই নি। এবার মনে হচ্ছে পাকড়াশী প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।'

জাহেদ মামাকে ভালো লাগলো; নেলী খালার মতো তিনিও আমাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বড়োদের মতো কথা বলেন। অথচ মা মনে করেন আমরা বুঝি এখনো ছোট আছি। দিব্যি হুকুম জারি করে বসলেন—বাড়ি থেকে বেরুনো চলবে না।

একটু পরে নেলী খালা এসে বললেন, 'তোমাদের একটা মজার জিনিস দেখাবো। ওদিকটায় চলো।'

আমরা অবাক হয়ে নেলী খালার সঙ্গে ছাদের রেলিঙের ধারে গেলাম। তিনি আমাদের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

অস্বাভাবিক কিছুই দেখলাম না। বড়ো রাস্তায় ব্যস্ত লোকজন, রিক্শা, সাইকেল, গাড়ি সব চলছে। আমাদের গলিটা বরাবরের মতোই শান্ত। সরকারদের রোয়াকে বসে বুড়ো অকা সরকার মণ্টুর দাদুর সঙ্গে পাশা খেলছেন। একটা ফেরিওয়ালা সুর করে 'চাই লেস ফিতা' বলে হেঁটে যাচ্ছে। লোকজনের চলাফেরা খুবই কম। আমাদের সদর দরজার পাশে কর্কশ গলায় 'আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা' বলে এক নুলো ফকির ভিক্ষা চাইছে, বেদানার মা কলসি কাঁখে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে রকিবদের বাড়িতে পানি দিতে যাচ্ছে— কোথাও মজার কোনো জিনিস দেখলাম না।

নেলী খালা বললেন, 'নতুন কিছুই বুঝি চোখে পড়ে নি?'

আমরা অবাক হয়ে মাথা নাড়লাম। 'নতুন আবার কি দেখবো!'

'ওই ফকিরটাকে দেখ!'

নেলী খালা কি বলতে চাইছেন বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হলো না। তড়বড় করে বললাম, 'ধরে ফেলেছি নেলী খালা। এই ফকিরটাকে নতুন মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই ও পাকড়াশীর চর হবে। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।'

মুখ টিপে হাসলেন নেলী খালা—'পাকড়াশীর নয়, ও ছে কর্নেল তানভীরের লোক। সন্দেহজনক কাউকে বাড়ির আশেপাশে দেখা গেলেই ও কর্নেলকে জানাবে। কর্নেল দরকার মনে করলে থানায় জানাবেন। না হলে নিজেরা ব্যবস্থা নেবেন। আজ দুপুরের পর থেকে বসেছে।'

বাবু বললো, 'ভালো ফন্দি এঁটেছেন তো কর্নেল! এবার নিশ্চয়ই পাকড়াশীর লোক ধরা পড়বে।'

পাকড়াশী যে কত সেয়ানা, সেদিন সন্ধে না হতেই টের পেলাম। আমি আর বাবু বিকেলের চা খেয়ে বাড়ির পেছনের বাগানে বসে গল্প করছিলাম। কলতলায় ক্ষেন্তির মা বসে থালা-বাসন মাজছিলো। কিছুক্ষণ পর বেদানার মা এসে একগাল হেসে ওকে বললো, 'অ ক্ষেন্তির মা, হুনছ, এক কারবাব ওইছে!'

ক্ষেন্তির মা জানতে চাইলো কি হয়েছে। বেদনার মা হি হি করে হাসতে হাসতে যা বললো, শুনে আমাদের চোখ ছানাবড়া। ওকে নাকি কোট-প্যাণ্ট পরা এক সাহেব পাঁচটা টাকা দিয়ে বলেছে, ওই নুলো ফকিরটাকে তোমাদের পাড়া থেকে বের করে দাও। আসলে নাকি ও ছেলেধরা। বেদানার মা বললো, 'সন্দ আমারও ওইছিলো ক্ষেন্তির মা। মানুষডা একে নতুন তার উপরে কেমুন কেমুন কইরা চাইয়া দ্যাখে। সাবে গো বাড়িত থেইকা শলার ঝাড়ুখান আইনা দিছি দুই বাড়ি—বিটলামির জাগা পাস না মিচকা শয়তান, কইয়া যেই আবার মারতে গেলাম ব্যাটায় থালি ফালাইয়া বাবা গো মাগো চিক্কইর পাইরা দিছে দৌড়। হি হি হি।'

বাবু চাপাগলায় বললো, 'সর্বনাশ হয়েছে আবির। শিগগির চলো নেলী খালার কাছে।'

নেলী খালা শুনে প্রথমে গম্ভীর হয়ে, 'ছি ছি কি কাণ্ড,' বলে জাহেদ মামাকে ঘটনাটা বললেন। তারপর নিজেই হেসে অস্থির হলেন—'বেশ হয়েছে, এমন আনাড়ি লোকদের বেদানার মার ঝাড়ুর বাড়ি খাওয়া দরকার।'

জাহেদ মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুমি হাসছো নেলী? কর্নেল শুনে কি ভাববেন বলতো?'

'কি আর ভাববেন, ইনফর্মারটার চাকরি খাবেন।' সহজ গলায় প্রশ্নের জবাব দিলেন নেলী খালা।

'কিন্তু পাকড়াশীর লোক ধরার কি হবে?'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, পুলিশের এই গবেটদের কম্মো নয় পাকড়াশীর মতো শয়তানকে শায়েস্তা করে।'

এমন সময় মা আসতেই—'তোমাদের বেদানার মার কাণ্ড শুনেছো?' বলে নেলী খালা পুরো ঘটনাটা বললেন। মা শুনে রেগে গেলেন—'বেদানার মার সাহস তো কম নয়, আমাদের ফকিরকে ঝাড়ুপেটা—'

'আহ্, শানু আপা!' বাধা দিলেন নেলী খালা—'আমাদের ফকির বলছো কেন? কাক-পক্ষীও যেন টের না পায় ফকিরটা আমাদের লোক। জানলে সব মাটি।'

আমি বললাম, 'কাক-পক্ষী টের না পেলেও পাকড়াশীর লোক ঠিকই জেনে গিয়েছে।'

নেলী খালার কথার জবাব দিতে না পেরে মা আমাদের ধমক দিলেন—'তুমি আবার বড়োদের মাঝখানে কথা বলতে এলে কেন? যাও, নিজের ঘরে যাও।'

মন খারাপ করে আমি আর বাবু চিলেকোঠার ঘরে চলে এলাম। রাতে খাওয়ার পর নেলী খালা এসে যখন বললেন, 'শিগগিরই তোমাদের পাথারিয়ায় বেড়াতে নিয়ে যাবো।' শুনে মন-টন সব ভালো হয়ে গেলো।

বাবু বললো, 'ললি টুনিকে আসতে বলবেন না?'

'তোমরা চাইলে নিশ্চয়ই বলবো।' মুখ টিপে হেসে বাবুর চিবুক নেড়ে আদর করে চলে গেলেন নেলী খালা। যাবার সময় বললেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আমরা খুব ভোরে বেরিয়ে যাবো।'

পাথারিয়ার পথে পল নিউম্যানের বন্ধু

নেলী খালাদের চলে যাওয়ার ঠিক দশ দিন পর পাথারিয়ায় বেড়াতে যাওয়ার চিঠি পেলাম। আমাকে আর বাবুকে একসঙ্গে আর মাকে আলাদা চিঠি লিখেছেন নেলী খালা। মাকে লিখেছেন, পাথারিয়ার জল হাওয়া এতো ভালো যে সারাক্ষণ শুধু খিদে পায়। এক মাসে আমাদের ওজন দশ পাউণ্ড বাড়বে এ কথা তিনি বাজি ধরে বলতে পারেন। আমার স্বাস্থ্য ভালো নয় এমন কথা নিন্দুকেও বলতে পারবে না, একমাত্র মা ছাড়া। সারাক্ষণ এ নিয়ে তাঁর অভিযোগের কথা নেলী খালা ভালো করেই জানেন। তাই মাকে পটানোর জন্যে ওভাবে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে কোনো রকম বিপদের কথা লেখা নেই।

আমাদের চিঠিটা খুবই ছোট। মনে হয় ভীষণ ব্যাস্ততার ভেতর তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। ওঁর গুটি গুটি অক্ষরগুলো সাইজে ডবল হয়ে গেছে। মোদ্দা কথা পরের রোববারেই যেন আমরা সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে বিকেলে বড়লেখা স্টেশনে নামি। যেতে হবে কুলাউড়ায় ট্রেন বদল করে।

এর ভেতর ললি টুনির দুটো চিঠি পেয়েছি। ওরাও পাথারিয়া যাচ্ছে। চিঠি পড়েই বুঝেছি আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছে ওরা। কবে যাবে সেটা লেখে নি। মনে হলো কুলাউড়ায় ট্রেন বদল করার সময় ওদের দেখা পাবো। নেলী খালা হয়তো এক সঙ্গে নিতে আসবেন আমাদের চারজনকে।

দুপুর দুটোয় আমি আর বাবু কুলাউড়া জংশনে নামলাম। বড়লেখার ট্রেন ছাড়বে তিনটায়। ওয়েটিং রুমে বসে মার দেয়া আলুর দম আর কিমা দিয়ে লুচি খেলাম। মা পই পই করে বারণ করে দিয়েছেন পথে যেন কিছু না খাই। ফ্লাস্কে গরম পানি দিয়েছেন হরলিক্স খাওয়ার জন্যে। দু' বোতল ঠাণ্ডা পানি। কমলাও দিয়েছেন চারটা। বাবা অবশ্য বারণ করেছিলেন কমলা দিতে—'কমলার দেশে যাচ্ছে—এখান থেকে আবার কমলা নেয়া কেন!'

'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। মাঝপথে যদি ট্রেন বিকল হয়ে যায়! যদি কোনো কারণে লেট হয়! কমলাওয়ালারা নিশ্চয়ই সারা পথ রেল লাইনের ধারে বসে নেই!' এই বলে মা হাতব্যাগের ভেতর ঠেসেঠুসে কমলাগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

ওয়েটিং রুমে বসে ভাবছি এই বুঝি চট্টগ্রামের ট্রেন এলো, ললি, টুনি এসে বুঝি নামলো প্ল্যাটফর্মে। কিছুই হলো না। চট্টগ্রামের ট্রেন আসার কথা একটায়, এলো তিনটা বাজার দশ মিনিট আগে। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে আমাদের পা রীতিমতো ব্যথা করতে লাগলো। টেনশনের জন্য বসেও থাকতে পারছিলাম না।

ললিদের না দেখে মন খারাপ হয়ে গেলো। বাবুকে বললাম, 'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম এ ট্রেনে ওরা আসবে।'

'মানুষের সব আশা কি পূর্ণ হয়!' দার্শনিকের মতো উদাস গলায় জবাব দিলো বাবু।

'কেন, চিঠিতে লিখেছিলাম তো রোববার আমরা যাচ্ছি, দুটোয় কুলাউড়া জংশনে পৌঁছবো।

'হয়তো চিঠি পায় নি।'

'পাবে না কেন? তিন দিন আগে জিপিও গিয়ে বাক্সে ফেলেছি।'

'বাংলাদেশে শুনেছি এক চিঠি নাকি বারো বছর পর ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছেছিলো।'

বড়লেখার ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজলো। আমরা দু'জন ফার্স্ট ক্লাসের কামরা খুঁজে বের করে উঠলাম। একটাই মাত্র ফার্স্ট ক্লাসের কামরা।

আমাদের আগে আরেকজন ভদ্রলোক উঠেছেন কামরাটায়। মুখোমুখি দুটো বার্থ। আমাদেরও বসতে হলো মুখোমুখি। ভদ্রলোকের মুখে সম্ভাষণের মৃদু হাসি। আমিও একটু

হাসলাম।

জাহেদ মামার চেয়ে বয়স বেশি হবে না ভদ্রলোকের, বরং কমই হবে। দেখলেই মনে হয় বিদেশ থেকে এসেছেন। দেখতে জাহেদ মামার চেয়েও হ্যাণ্ডসাম। অনেকটা পল নিউ-ম্যানের মতো। দামী একটা সুটকেস ওপরের বার্থে, পাশে ওটার ম্যাচিং হ্যাণ্ডব্যাগ। বৃটিশ এয়ারওয়েজ-এর ট্যাগ লাগানো।

ট্রেন ছাড়ার পর ভদ্রলোক পাইপ বের করে ধরালেন। তামাকের নাম দেখলাম ক্ল্যান। মিষ্টি গন্ধে কামরাটা ভরে গেলো। তামাকের গন্ধ যে এত সুন্দর হয় জানা ছিলো না। ভদ্র-লোক আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কদ্দুর যাবে তোমরা?'

জবাব দিলাম, 'পাথারিয়া।'

'বেড়াতে যাচ্ছো বুঝি?'

মাথা নেড়ে সায় জানালাম। তারপর কোন ক্লাসে, কোন স্কুলে পড়া হয়, নাম কি এসব জিজ্ঞেস করলেন আমাকে আর বাবুকে। তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর আমাদের প্রশ্ন করার পালা।

'আপনি কোথায় যাবেন?'

মৃদু হেসে বললেন, 'বড়লেখা।'

'বেড়াতে যাচ্ছেন?'

'বেড়ানো আর কাজ দুটোই।'

'এই প্রথম যাচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই প্রথম। বাংলাদেশেও এলাম প্রায় এক যুগ পর।'

'আপনি কি বিদেশে থাকেন?'

'হ্যাঁ। কানাডার মন্ট্রিলে।'

'কবে থেকে আছেন সেখানে?'

'আমার জন্ম হয়েছে ওখানে। আমার বাবা-মা এখন কলকাতায় থাকেন। ওখানেই সেটল্ করেছেন। আমার দাদামশাইর বাড়ি শুনেছি বিক্রমপুর।'

'আপনার নামটা এখনো জানা হয় নি।'

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'কিশোর পারেখ। এ্যাড ফার্মে কাজ করি। সখ হচ্ছে ছবি বানানো।'

একজন জলজ্যান্ত চিত্র-নির্মাতার সঙ্গে কথা বলছি ভেবে রীতিমতো রোমাঞ্চ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাটা ছবি বানিয়েছেন আপনি? কি ধরনের ছবি?'

'ছবি দেখতে বুঝি খুব ভালোবাসো? আমি শর্ট ফিল্ম বানাই। কলকাতার স্লাম এরি-য়ার ওপর গত বছর একটা ছবি বানিয়েছি। এবার হাত দিয়েছি চা বাগানের ওপর। গোটা দশেক বানিয়েছি এ পর্যন্ত। এর ভেতর সাতটাই বি বি সি কিনে নিয়েছে। দুটো ছবি এ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে। চা বাগানেরটাও ওরা কিনবে। জানো তো ব্রিটিশরাই এদেশে চায়ের চাষ আরম্ভ করেছিলো?'

মাথা নেড়ে সায় জানালাম। বাবু বললো, 'আপানাকে দেখতে পল নিউম্যানের মতো লাগে। আপনি ছবি না বানিয়ে অভিনয় করলে দারুণ হতো।'

হা হা করে গলা খুলে হাসলেন কিশোর পারেখ। 'কথাটা তুমি প্রথম বলো নি বাবু। ক্যালিফোর্নিয়ায় একবার পল নিউম্যানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো আমার এক বন্ধুর ছবির

শুটিং-এ। পল নিউম্যান নিজেই বললো, আমাকে দেখে নাকি তার ইয়ং এজ-এর কথা মনে হচ্ছে।'

কিশোর পারেখের কথা শুনে বাবু আর আমি হতবাক। বলে কি, পল নিউম্যানের সঙ্গে কথা বলেছে! পরে মনে হলো, হতেও পারে। ওদের ওখানে ইণ্ডিয়ানদের নাকি বেশ কদর। কিশোর পারেখ মৃদু হেসে বললেন, 'অভিনয়ের চেয়ে ছবি বানানোটা আমার কাছে বেশি থ্রিলিং মনে হয়।'

বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, কানাডায় জন্ম হলেও আপনি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলেন।'

'বাংলা ঠিকমতো না বললে বাবা বেত মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবেন যে! আমার স্কুল শেষ করেই মাকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। চেয়েছিলেন, আমিও চলে আসি। আমার কাছে মন্ট্রিল বেশি ভালো লাগে। কলকাতার জন্য বাবা-মার যতো নস্টালজিয়া, আমার তা নেই, তবু বছরে এক মাস এসে ওঁদের সঙ্গে থাকতে হয়। এবার অবশ্য কুড়ি দিন ছিলাম।'

'আপনার বুঝি কোনো ভাই-বোন নেই?'

'বোন আছে একটা। কলকাতায় বাবা-মার সঙ্গে থাকে। ডাক্তারি পড়ছে। এবার ফোর্থ ইয়ারে।'

আমি বললাম, 'আপনার নামের পদবি কি বাঙালিদের ভেতর আছে?'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন কিশোর পারেখ—'দারুণ ইন্টেলিজেন্ট ছেলে তুমি! ক্লাসে নিশ্চয়ই ফার্স্ট হও! তুমি ঠিক ধরেছো। পারেখ বাঙালিদের পদবি নয়। আমার ঠাকুরদার বাবা ব্যবসা করার জন্য মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতা এসে সেটল্ করেছিলেন। বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কেউ মহারাষ্ট্র ফিরে যায় নি।'

বাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ও তখনো ধাতস্থ হতে পারে নি। পারবেই বা কি করে! ক্রিস্টোফার লী কিম্বা ভিনসেন্ট প্রাইসের কথা বললেও না হয় ধাক্কাটা সামলানো যেতো! একেবারো খোদ পল নিউমান! 'বুচ ক্যাসেডি এ্যাণ্ড সানড্যান্স কিড' দেখার পর থেকে আমরা দু'জন পল নিউম্যান আর রবার্ট রেডফোর্ডের ভক্ত হয়ে গেছি। বাবুকে বললাম, 'নেলী খালা ওঁর কথা শুনলে বিশ্বাসই করবে না।'

'কি বিশ্বাস করবে না?' একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কিশোর পারেখ।

'পল নিউম্যানের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে।'

'হা হা হা'— গলা খুলে হাসলেন কিশোর পারেখ—'আমার একটা ছবি ছিলো, মুভি মোগলস অব হলিউড। ওই ছবি করতে গিয়ে হলিউডের বহু ডিরেক্টর, প্রডিউসর আর স্টারদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, পিটার ওটুল, অড্রে হেপবর্ণ আর আর্লোন ব্রাণ্ডোর স্যুটিং-এর ছবি তুলেছি।'

উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'আপনাকে এক দিন নেলী খালাদের বাড়িতে আসতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই যাবো।' মিষ্টি হেসে কিশোর পারেখ বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার অনেক লাভ হয়েছে। ভাবছিলাম অচেনা জায়গায় কেমন লাগবে। বন্ধু হিসেবে আমাকে নিশ্চয়ই তোমাদের খুব একটা খারাপ লাগবে না?'

বাবু বললো, 'আপনাকে আমরা কিশোরদা ডাকবো।'

আগের মতো মিষ্টি হাসলেন তিনি—'আমি খুশি হবো।'

ট্রেন তখন যাচ্ছিলো দিগন্তজোড়া খোলা এক মাঠের মাঝখান দিয়ে। বিকেলের নরম কমলা রঙের রোদ এসে পড়েছে আমাদের কামরার ভেতর। কিশোরদার মুখে লালচে আলোর আভা কাঁপছে। মনে হচ্ছিলো বুচ ক্যাসেডির পল নিউম্যানের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন কোনো শহরে যাচ্ছি।

কিশোরদা বললেন, 'তোমাদের ফ্লাস্কে কি গরম জল আছে?'

বাবু তড়বড় করে বললো, 'গোটা ফ্লাস্ক ভর্তি। হরলিক্স খাবেন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন কিশোরদা, 'হরলিক্স বাদ দাও। আমার কাছে ব্রাজিলিয়ান কফি আছে। তোমরা যদি খাও, তোমাদের সঙ্গে আমিও এক কাপ খাই। আমার গরম জল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই ফুরিয়ে গেছে।'

আমি ফ্লাস্কটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনার ফ্লাস্ক ছোট।'

'তাছাড়া কফিটা আমি একটু বেশি খাই।' হাসতে হাসতে বললেন কিশোরদা।

কফি তিনি শুধু বেশি খানই না, বানানও চমৎকার। আমি আর বাবু মুগ্ধ হয়ে ওঁর কফি বানানো দেখলাম। ফ্লাস্কের দুটো কাপে কফি বানিয়ে আমাদের খেতে দিলেন। বললেন, 'এ কফিটা এমনিতে খুব কড়া, তোমাদের জন্য হালকা করে বানিয়েছি।'

'কফির গন্ধের সঙ্গে মিষ্টি একটা পোড়া গন্ধ, খেতে বেশ মজাই লাগলো। বললাম, 'দারুণ হয়েছে।'

কফি খেতে খেতে কিশোরদা বললেন, 'অনেক বছর পর বাংলাদেশে এসে কি যে ভালো লাগছে! এবার ওয়েদারটাও চমৎকার?'

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকছিলো আমাদের কামরায়। এলো-মেলো বাতাসে কিশোরদার লালচে চুলগুলো কপালের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমার আর বাবুর গায়ে গরম জ্যাকেট। কিশোরদার গায়ে হালকা কার্ডিয়ান। শীতের দেশে থাকেন বলে আমাদের চেয়ে শীত ওঁর কমই লাগার কথা। মা আমাদের সুটকেসে গরম কাপড় ভালো করেই ঠেসে দিয়েছেন।

বাবু বাইরে তাকিয়ে ট্রেনের সঙ্গে গাছপালা, ঘরবাড়ির ছুটে চলা দেখছিলো। বললো, 'শীতের বিকেলগুলো কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।'

সূর্য কখন পশ্চিমের লল-বেগুনি রঙের মেঘের আড়াল দিয়ে ডুবে গেছে টেরও পাই নি। ঘড়িতে তখন মাত্র পাঁচটা বাজে। কিশোরদা মৃদু হেসে বললেন, 'ট্রেনের শব্দ শুনে কি মনে হচ্ছে বলো তো?'

বাবু অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কি মনে হবে?'

'ট্রেন বলছে—পাথারিয়া কতদূর, পাথারিয়া কতদূর।' এই বলে কিশোরদা আমার দিকে তাকালেন—'তাই না আবির?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার এ কথা মনে হবে কেন? আপনি তো পাথারিয়া পর্যন্ত যাবেন না।'

কিশোরদা আগেই বলেছিলেন, তিনি উঠবেন বড়লেখা স্টেশন থেকে দু'মাইল দূরে ইটাগঞ্জ টী এস্টেটে। ওখানকার ম্যানেজার নাকি ওঁর বন্ধু।

বাবু জানতে চাইলো, 'পাথারিয়া আসলে কতদূর।'

'মনে হয় না আর বেশি দূর হবে।' ঘড়ি দেখে কিশোরদা বললেন, 'আমার বন্ধুটি বলেছিলো, পাঁচটা নাগাদ বড়লেখায় পৌঁছবে।'

ঠিক পাঁচটা বারো মিনিটে ট্রেন এসে থামলো বড়লেখা স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে দেখলাম

নেলী খালা ব্যাস্ত হয়ে সামনের কামরাগুলোতে আমাদের খুঁজছেন। বাবু হঠাৎ উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আবির, দেখ দেখ, নেলী খালার সঙ্গে কে এসেছে!'

বুকের ভেতর উত্তেজনা আর আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখি নেলী খালার সঙ্গে ললি টুনিও আমাদের খুঁজছে। ট্রেন তখনো থামে নি, আস্তে আস্তে ফোঁশ ফোঁশ নিঃশ্বাস ফেলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'নেলী খালা, আমরা এখানে।'

আমাদের উত্তেজনা দেখে কিশোরদা বেশ অবাকই হয়েছেন। বললেন, 'নেলী খালার কাছে গিয়ে নিশ্চয়ই আমাকে তোমরা ভুলে যাবে!'

আমি একটু লজ্জা পেলাম—'তা কেন কিশোরদা! আমি তো চাই আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।'

আমার ডাক শুনে নেলী খালা ছুটে এসে ট্রেন না থামতেই কামরায় উঠে পড়লেন। পেছন পেছন ললি টুনিও হুড়মুড় করে ঢুকলো। নেলী খালা বললেন, 'কখন থেকে বসে আছি, তোদের পাত্তাই নেই।'

নেলী খালার কথার ধরন দেখে আমি হেসে ফেললাম—'এমনভাবে বলছো যেন আমরাই ট্রেনটা চালিয়ে এনেছি।'

টুনি বললো, 'চেহারা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে—একজন ড্রাইভার, আরেকজন হেল-পার।'

ললি মৃদু হেসে চাপা গলায় টুনিকে বললো, 'আহ, টুনি, আসতে, না আসতেই তুমি ওদের পেছনে লেগেছো!'

টুনি তড়বড় করে বললো, 'তুমি দেখো নি ললিপা। বাবু আমাকে জিভ দেখিয়েছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'বাবুর সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করো। নেলী খালা, এসো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন কিশোর পারেখ। শর্ট ফিল্ম বানান, কানা-ডায় থাকেন, বড়লেখায় এসেছেন বেড়াতে।'

নেলী খালা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'বড়ো খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বড়-লেখায় থাকছেন কোথায়?'

কিশোরদা আলতোভাবে নেলী খালার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ইটাগঞ্জ টী এস্টেটে। আমার বন্ধু মনি ওখানে ম্যানেজার। আপনার কথা আবিরদের কাছে অনেক শুনেছি। যদিও ট্রেনেই আলাপ, তবু মনে হচ্ছে আমরা চমৎকার বন্ধু হয়ে গেছি।'

কিশোরদার কথার মাঝখানে তাকিয়ে দেখি টুনি গোল গোল চোখে ওকে দেখতে দেখতে বাবুর কানে কানে কি যেন বলছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না পল নিউম্যান প্রসঙ্গেই কথা বলছে ও। বাবুও মুখ টিপে হেসে মাথা নেড়ে সায় জানালো।

আমরা সবাই ঝটপট নেমে পড়লাম প্ল্যাটফর্মে। দেখি কিশোরদার বন্ধুও এসে গেছেন। কিশোরদার সমবয়সী হবেন, শক্ত-সমর্থ পোড়-খাওয়া চেহারা। হাসি মুখে এগিয়ে এসে হাত মেলাতে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কিশোরদাকে। বললেন, 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুই সত্যি সত্যি এসেছিস।'

কিশোরদা হাসতে হাসতে ওঁর বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তোর কি মনে হচ্ছে আমি সত্যি সত্যি আসি নি, আমার ভূত এসেছে?'

ওঁর কথা শুনে আমরা সবাই হেসে ফেলালাম। কিশোরদা সামলে নিয়ে ওঁর বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওরা আমাকে কিশোরদা বললেও আমি কিন্তু ওদের বন্ধু হয়ে গেছি।'

কিশোরদার বন্ধু মৃদু হাসলেন—'তাহলে আমাকে তোমরা মনিদা ডেকো।' এই বলে নেলী খালার দিকে তাকালেন, 'আপানাদের বাংলো আমি চিনি, কিশোরকে নিয়ে কাল-পরশু চলে আসবো।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।' মিষ্টি হেসে নেলী খালা বললেন, 'নতুন এসেছি, কারো সঙ্গে ভালো করে পরিচয়ও হয় নি।'

মনিদা বললেন, 'চলুন রওনা হই, আপনি তো জীপ এনেছেন। প্ল্যাটফর্মে আপনাকে দেখেই কিন্তু আমি অনুমান করেছিলাম আপনি কে!'

নেলী খালা মৃদু হেসে ওদের বিদায় জানালেন। কিশোরদা আমাদের সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

ছোট্ট স্টেশন বড়লেখা। আমরা ছাড়া আর যারা নেমেছিলো তারা আগেই বেরিয়ে গেছে। নেলী খালা আমাদের নিয়ে জীপে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বললেন, 'পাথারিয়া পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। রাস্তা খুব খারাপ। আসতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছিলো।'

চোখের পলকে এক রত্তি শহরটা পেছনে ফেলে দুপাশে ধান ক্ষেত, চা বাগান, খোলা মাঠ পেরিয়ে আমাদের হুড খোলা জীপ ছুটে চললো পাথারিয়ার দিকে। বাবু আর টুনি সামনে নেলী খালার পাশে বসে কলকল করে অনর্গল কথা বলছিলো, হাসছিলো। আমি আর ললি ছিলাম একেবারে চুপচাপ। ললির ঠোঁটের ফাঁকে শীতের শেষ বিকেলের আলোর মতো এক টুকরো মিষ্টি হাসি। আশ্চর্য রকম সুন্দর লাগছিলো ওকে।

পিকনিকে আরেক ঝামেলা

দূর থেকে নেলী খালাদের ছবির মতো বাংলো দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। চারপাশে নকশাকাটা কাঠের রেলিং ঘেরা চওড়া বারান্দা, উঁচু এ্যাসবেস্টসের চাল, পোর্টিকোর দুপাশ থেকে বোগেনভিলিয়ার লতানো ঝাড় চালের অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে, গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল ফুটে আছে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো। নেলী খালা বললেন, 'যাই বলিস, জাহেদ কিন্তু

চমৎকার বাংলো ম্যানেজ করেছে। অনেক আগে চা বাগানের বিলেতি ম্যানেজার নাকি সখ করে বানিয়েছিলো।' আমি জানতে চাইলাম, 'সাহেব ভূতের উৎপাত নেই তো?'

আমার কথা শুনে ললি মৃদু হাসলো। নেলী খালা হাসতে হাসতে বললেন, 'না, এখনো শুরু হয় নি।'

পোর্টিকোর নিচে জীপ থামতেই সবার আগে ছুটে এলো স্ক্যাটরা। এক লাফে নেলী খালার গায়ের ওপর পা তুলে আদরের জন্য চোখ বুজে গলাটা বাড়িয়ে দিলো। তারপর আমাদের গা শুঁকে অভ্যর্থনা জানালো। নেলী খালা বললেন, 'স্ক্যাটরা জায়গাটা খুব পছন্দ করেছে।'

ভেতর থেকে নানু বেরিয়ে এলেন। খবরের কাগজ পড়ছিলেন বোধ হয়—হাতে নিয়েই বেরিয়েছেন। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আরো আগে আশা করছিলাম তোমাদের। ট্রেন নিশ্চয়ই লেট করেছে!'

আমি আর বাবু নানুর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম! টুনি বললো, 'পুরো পঁচিশ মিনিট লেট করেছে ট্রেন।'

বাবু বললো, 'বাংলাদেশের ট্রেন পঁচিশ মিনিট লেট করেছে, এটা বলার মতো কোনো ব্যাপার নয়।'

'কে বলেছিলো বাংলাদেশের ট্রেনে উঠতে?' সুযোগ পেয়ে বাবুকে খোঁচাতে ভুললো না টুনি—'আমেরিকা থেকে কয়েকখান ট্রেন সঙ্গে নিয়ে এলে না হয় বুঝতাম।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, বাবু টুনিকে জিব দেখিয়ে ভালো মানুষের মতো নানুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। আর টুনি কিছু বলতে গিয়ে ললির চিমটি খেয়ে থমকে গিয়ে কট-মট করে তাকালো বাবুর দিকে। নেলী খালা বললেন, 'মেয়েদের পাশের ঘরটা তোমাদের। এখনো সব গোছানো হয় নি, কাল থেকে তোমরা আমাকে ঘর গোছাতে সাহায্য করবে।'

টুনি আদুরে গলায় বললো, 'বারে, কাল যে আমাদের পিকনিক যাওয়ার কথা নেলী খালা!'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'নেলী খালা আমাদের বলেছেন ঘর গোছাতে। আমাদের নিশ্চয়ই পিকনিকে যাওয়ার কথা নয়।'

'বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।' হাসতে হাসতে নেলী খালা বললেন, 'ললি, টুনি আগেই ঠিক করে রেখেছে, তোমরা আজ এলে, কাল তোমাদের নিয়ে পিকনিক করবে।'

নানু বললেন, 'তোমারা ঘরে যাও। কাপড়-জামা বদলে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে এসো। নেলী, বড়িবিকে টেবিল লাগাতে বলো। জাহেদ বলেছে ওর ফিরতে রাত হবে।'

টুনি যাওয়ার আগে বাবুকে টুক করে একটু খানি ভেংচি কাটলো, কেউ দেখতে পেলো না, এমনকি ললিও নয়। বাবু একটু গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করলো—'টুনিটা ভারি ফাজিল হয়েছে।' এই বলে বিছানার ওপর বসলো।

নুলিয়াছড়ির বাড়ির মতো ঘরগুলো বড়ো না হলেও দেখতে সুন্দর। এক দিকের দেয়ালে পুরোনো আমলের ফ্রেমে বাঁধানো সমুদ্রে সূর্য ডোবার পেইন্টিং, নিচে দুটো গদিওয়ালা চেয়ার, অন্য দিকের দেয়ালে বারান্দামুখি দুটো বড়ো কাচের দরজা। একদিকে বড়ো একটা ওয়ার্ডরোব, মাঝখানে দুটো সিঙ্গেল খাট। খাটের পাশে ছোট বেডসাইড কার্পেট। মেঝেতে লাল-কালো সিমেন্টের চৌকো নকশা আঁকা।

আমি সুটকেস খুলে দরকারি কাপড়গুলো ওয়ার্ডরোবে রাখতে রাখতে বললাম, 'টুনির জন্য কি এনেছিলে, দেবে না?'

বাবু ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার আগে ললির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আমি হাসতে হাসতে বললাম, টুনিকে তুমি দু'বার জিব দেখিয়েছো। একহাতে তালি বাজে না বাবু।'

আমার কথা শুনে বাবু, হেসে ফেললো—'দু'বার নয় তিনবার, টুনি দেখিয়েছে চার বার। তুমি সব দেখেছো তাহলে?'

'না দেখে উপায় কি! ললিও দেখেছে। কাল পিকনিকে যাচ্ছো তো? ঘর গোছাতে চাইলে আমাকে পাচ্ছো না।'

'না গিয়ে উপায় কি।' লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাবু একটু করুণ গলায় বললো, 'জানতাম, ওদের পেলে তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

আমি হেসে ফেললাম—'সন্ধের পর তুমি কতবার আমার সঙ্গে কথা বলেছো হিসেব রেখেছি!'

'কি সাংঘাতিক!' বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো বাবু। 'তুমি এত কিছু খেয়াল করো নাকি! বুঝেছি, ললির কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।'

'ললি তো বলে ওর জন্য আমাকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।'

'কেন, ও কি করেছে?'

'হার্টের অসুখটা নিয়ে ও বড়ো বেশি ভাবে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবুর ছেলেমানুষি থেমে গেলো। গম্ভীর হয়ে বললো, 'বেচারা! ওর অসুখের কথা মনে হলে সত্যি খারাপ লাগে। টুনি একবার লিখেছিলো, ডাক্তার নাকি বলেছে হঠাৎ একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।'

আমি কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে সায় জানালাম। কথাটা আমিও জানি। লক্ষ করেছি গতবারের চেয়ে এবার ললিকে একটু বেশি গম্ভীর মনে হচ্ছে।

বাইরে থেকে নেলী খালা ডাকলেন, 'আবির, বাবু, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে খেতে এসো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সবাই খাবার টেবিলে বসে গেছে। জাহেদ মামা তখনো আসেন নি। বড়িবি ট্রেতে করে বাটি এনে টেবিলে রাখছে। নুলিয়াছড়ির মতো ললি আর টুনি বসেছে একদিকে। নেলী খালাও ওদের সারিতে। আমরা ওদের মুখোমুখি বসলাম। মাঝখানে বসেছেন নানু।

টেবিলের বাটিতে ধোঁয়া-ওঠা মাংস আর কয়েক রকম সবজির রান্না। দেখে টের পেলাম বেশ খিদে লেগেছে। নানু বললেন, 'সবাই নিজে নিজে তুলে নাও, খেতে বসে লজ্জা কোরো না।'

খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে বাবু বললো, 'মনে হচ্ছে কাল সারাদিন না খেলেও চলবে।'

আমি হেসে বললাম, 'কাল টুনি রান্না করবে। না খেয়ে বুঝি পার পাবে?'

বাবুও হেসে ফেললো—'তাই তো বলছি। উল্টো-পাল্টা কি-না-কি রান্না করে, না খেলেও অসুবিধে হবে না।'

'কে উল্টো-পাল্টা রেঁধেছে শুনি?' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন নেলী খালা।

'আপনি না। আমি টুনির কথা বলছি।' আমতা-আমতা করে বাবু বললো, 'কাল পিকনিকে কি-না-কি রান্না হয়—'

'পিকনিকে যদি উল্টো-পাল্টা রান্না না হয় তবে তো অর্ধেক মজাই মাটি। আজ আর রাত জেগো না। কাল ভোরে উঠতে হবে। মেয়েদেরও বলেছি ঘুমিয়ে পড়তে।' এই বলে নেলী খালা ঘরের আলো নিভিয়ে নীল ডিম লাইট জ্বালিয়ে চলে গেলেন।

'আমার সত্যি সত্যি ঘুম পেয়েছে।' হাই তুলে বাবু বললো, 'তুমিও শুয়ে পড়ো আবির।'

সারা দিনের ট্রেন জার্নির পর আমারও ঘুম পাচ্ছিলো। স্লিপিং ড্রেস পরে কম্বলের নিচে ঢুকে চোখ বন্ধ করতেই মনে হলো ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছি আর ট্রেনটা 'পাথারিয়া কতদূর, পাথারিয়া কতদূর' বলে এক বিশাল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুটো লাল-সাদা মাসতাং ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটছে পল নিউম্যান আর রবার্ট রেডফোর্ড। দেখতে দেখতে ট্রেনটা চলে গেলো টেক্সাসের দিগন্ত জোড়া মরুভূমির ভেতর। রুক্ষ প্রান্তরের এখানে-সেখানে দুটো বিরাট ক্যাকটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের দুলুনি অনুভব করতে করতে এক সময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পুরো নয় ঘণ্টা ঘুমিয়ে ছিলাম একেবারে মড়ার মতো। হঠাৎ মনে হলো রবার্ট রেড-ফোর্ড কি যেন বলছেন। চোখ কচলে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি রেডফোর্ড বলছে 'আর কত ঘুমোবে ইয়ংম্যান!'

পাশ ফিরে শুতে যাবো, কানের ভেতর কে যেন পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি টুনি ফিক ফিক করে হাসছে, পেছনে জাহেদ মামা দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে বললেন, 'অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি, শোনো নি?'

হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমি তো ভাবলাম রবার্ট রেডফোর্ড।'

টুনি হি-হি করে হাসতে হাসতে বললো, 'জাহেদ মামা, দেখেছেন? বাবুর কাছে আমে-রিকার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমের ভেতরও ওখানকার স্বপ্ন দেখছে। এইবার আসলটাকে দেখাচ্ছি।' এই বলে টুনি বাবুর কানের ভেতর পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো।

বাবু কম্বলে মাথা ঢেকে বললো, 'আবির, ভালো হবে না বলছি।'

টুনির হাসি আর থামে না। আমি বাবুকে ধাক্কা দিলাম—'আমাকে নয়, যাকে বলার তাকে বলো?'

টুনি একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বাবু বিরক্ত হয়ে উঠে বসলো—'কাকে কি বলবো?'

জাহেদ মামাকে দেখে বাবু লজ্জা পেলো। বললো, 'জাহেদ মামা, কখন এসেছেন? নেলী খালা আপনার জন্য বসে আছেন।'

'এসে এক ঘুম দিয়ে উঠেছি। এখন সকাল সাতটা। সবাই তোমাদের এক ঘণ্টা আগে উঠে রেডি হয়ে আছে। বাথরুমে গরম পানি আছে। গোসল সেরে ফেলো।'

তাই তো! মনে পড়লো, আজ পিকনিক। কম্বল ফেলে ছুটলাম বাথরুমে। বাবু গেলো আরেকটায়। কুড়ি মিনিটের ভেতর দুজন তৈরী হয়ে খাবার টেবিলে এলাম। নেলী খালা-দের নাশতা খাওয়া ততক্ষণে হয়ে গেছে। বললেন, 'তোমরা এতোটা পথ ট্রেন জার্নি করেছো, তাই আগে ঘুম ভাঙাই নি। টুনি জোর কার জাহেদকে পাঠালো তোমাদের ঘুম ভাঙাবার জন্য।'

ললি, টুনি স্টোর-রুম থেকে জিনিসপত্র বের করছিলো। মাঝে মাঝে টুনির গলা শোনা যাচ্ছিলো। বড়িবি একটা একটা করে পরোটা ভেজে গরম থাকতে থাকতে আমাদের এনে দিচ্ছিলো। একটু পরে ললি এসে বললো, 'লাকড়ি কি এখান থেকে নিতে হবে নেলী খালা?'

সাদা প্যান্টের ওপর সাদা-কমলা জংলী ছাপের কামিজ আর তার ওপর কমলা রঙের

কার্ডিগান পরেছে ললি। চুলগুলো খোলা, কালো বোধ হয় শ্যাম্পু করেছে। চশমার নিচে বিষণ্ণ মায়াময় দুটি চোখ। মুখটাকে মনে হলো শিশির-ভেজা ভোরের শিউলি ফুলের মতো। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হাসলো ললি। নেলী খালা বললেন, 'লাকড়ি যদি এখান থেকে নেবে, তাহলে আর পিকনিক কেন ললি! তোমাদের জাহেদ মামা একটু আগে বলছিলো, বাবুর্চিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। ওকে আমি বকে দিয়েছি।'

টুনি চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এতোক্ষণ ওখানে কি করছো ললিপা? সব কাজ আমি একা করবো নাকি!'

ললি একটু লজ্জা পেয়ে চলে গেলো। নাশতা শেষ করে আমি আর বাবু গেলাম ওদের যদি সাহায্যের দরকার হয়। বাবু জানতে চাইলো, 'কি করতে হবে বলো।'

টুনি বললো, 'এতোক্ষণে এলেন—কি করতে হবে। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে জীপে তুললে তো হয়।'

বাবু আর আমি হাঁড়ি-পাতিল, বালতি, পানিভর্তি জেরিকেন, চারটা মুরগি আর টুকরি বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে জীপে রাখলাম। বাবু এসে বললো, 'এবার বলো তোমাদের জীপে তুলে দেবো নাকি!'

টুনি বাবুকে জিব দেখিয়ে বললো, 'সখ কতো দেখো না ললিপা!'

ললি মৃদু হেসে বললো, 'আমি কিন্তু তোমাকে কিছু বলি নি বাবু।'

'সরি।' একটু লজ্জা পেলো বাবু—'আমরা কি এখনই রওনা দেবো?'

নেলী খালা এসে বললেন, 'তোমরা গাড়িতে উঠে বসো। জাহেদ আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায় ললি?'

প্রশ্ন শুনে আমাদের দিকে তাকালো ললি। বললো, 'কাল সকালে গিয়ে দেখে এসেছি। বেশি দূরে নয়। জায়গাটা সুন্দর। অনেক গাছ আছে, পুকুর আছে।'

আমরা চারজন জীপের পেছনে উঠলাম। স্ক্যাটরা আমাদের আগে থেকেই উঠে বসেছিলো। নেলী খালা আর জাহেদ মামা একটু পরেই এলেন। নানু দুপুরে যাবেন। জাহেদ মামা জীপে স্টার্ট দিয়ে বললেন, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর সোজা চলে আসবো তোমাদের কাছে।'

নেলী খালা বললেন, 'জিনিসপত্র সব ঠিকমতো দেখে নিয়েছো তো ললি?'

টুনি বললো, 'আমি সব লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছি নেলী খালা। ললিপার যা ভুলো মন!'

জাহেদ মামা গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'কবিদের একটু ভুলো মন হয়।'

লজ্জায় লাল হয়ে ললি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। কদিন আগে কচি কাঁচার আসরে ললির কবিতা ছাপা হয়েছে। আমি যদিও লুকিয়ে গল্প লিখি, এখন পর্যন্ত আমার কোনো লেখা কোথাও ছাপতে দিই নি। এর আগে ললির পাঁচটা কবিতা কচি কাঁচার আসর আর খেলাঘরে ছাপা হয়েছে। টুনি বললো, 'স্কুলে আমাদের বাংলার ডালমুট আপা ললিপার নাম দিয়েছেন কামিনী রায়।'

ললি একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'এসব কথা তোমার কাছে কে শুনতে চেয়েছে টুনি?'

জাহেদ মামা বললেন, কামিনী রায়ের মতো কবি হতে পারাটা খারাপ কিছু নয় ললি।'

বাবু বললো, 'আমি তোমাদের স্কুলে থাকলে টুনির নাম রাখতাম গেছোনী রায়।'

বুঝতে না পেরে টুনি ঠোঁট বাঁকালো—'এটা কোনো নাম হলো? গেছোনী মানে কি?'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'গেছোনী মানে গেছো পেত্নি, মানে তুমি।'

'কি!' চিৎকার করে টুনি বাবুকে মারার জন্য যেই হাত তুলেছে, তক্ষুণি জীপটা গর্তে পড়ে ঝাঁকুনি খেলো আর বাবুর মাথার সঙ্গে টুনির মাথার ঠোকাঠুকি হয়ে গেলো।'

নেলী খালা মৃদু হেসে জাহেদ মামাকে বললেন, 'আস্তে চালাও, আমরা এসে গেছি।'

দশ মিনিটের ভেতর আমরা পিকনিকের জায়গায় চলে এলাম। ললি ঠিকই বলেছিলো, এক কথায় অপূর্ব সুন্দর জায়গা। জীপটা এসে থামলো পুরোনো একটা রেইনট্রির নিচে। গাছের গুঁড়িটা বেগুনি, সাদা আর গোলাপী অর্কিড ফুলে ছেয়ে আছে। পাশে বেশ বড়ো একটা পুকুর। দু' দিকে উঁচু টিলার মতো। গাছগুলো সব অনেক পুরনো। বুনোলতা আর আগাছায় জঙ্গল হয়ে আছে। পুকুরটা কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হলো না। অর্ধেকের বেশি সবুজ দাম-শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। পানির রঙ টলটলে কালো। মাঝে মাঝে একটা দুটো বড়ো মাছ ঘাই দিচ্ছে। চারদিক একেবারে শুনশান, গুবরে পোকার উড়ে যাওয়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে। কোথাও ঝোপের আড়ালে বুনো ফুল ফুটেছে। মিষ্টি অথচ কড়া একটা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। বাবু বললো, 'এর চেয়ে সুন্দর জায়গায় পিকনিক করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

জাহেদ মামা আমাদের নামিয়ে দিয়ে জিপে সোঁ-সোঁ শব্দ তুলে চলে গেলেন। জীপের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আবার সেই ঝাঁঝালো গন্ধ-ভরা নীরবতা। নেলী খালা দুটো বড় চাদর পাশাপাশি বিছিয়ে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখলেন। ঘড়ি দেখে বললেন, 'নটা বাজতে চলেছে। আবির, বাবু জলদি কিছু শুকনো পাতা আর লাকড়ি নিয়ে এসো। ততক্ষণে আমরা চুলোটা বানিয়ে ফেলি।'

স্ক্যাটরা বোধ হয় প্রকৃতির ডাক শুনেছিলো। জীপ থামার সঙ্গে সঙ্গেই একছুটে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। আমি আর বাবু ধারালো কাটারি নিয়ে জঙ্গলের দিকে গেলাম। একটু পরেই শুনি স্ক্যাটরার গর্‌গর্‌ গলার আওয়াজ। সন্দেহজনক কিছু দেখলে ও এরকম শব্দ করে। বাবু আমার দিকে তাকালো। পা টিপে টিপে স্ক্যাটরার কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। কোথাও জনমানুষের কোনো সাড়া নেই। দুটো ঘুঘু পাখি শুধু অবিরাম ডেকে চলেছে।

আমাদের দেখে স্ক্যাটরা খুশি হয়ে সামনের ঝোপটার দিকে দৌড়ে গেলো। ঠিক তক্ষুণি রোগা লিকপিকে একটা লোক ঝোপের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আমাকে সামনে পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো—'ইয়াল্লা! আস্তা আজরাইল আইছে রে। ইতা আমারে খাইয়া ফালাইব রে।'

লোকটার কাণ্ড দেখে শুধু আমি আর বাবু নয়, স্ক্যাটরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেলো। খুবই নিরীহ চেহারার, পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর, মাঝবয়সী লোকটা তড়বড় করে বললো, 'আফ-নারার কুত্তারে আটকাউকা। ইডা মানুষ মারি ফালাইতো ফারে। আমি তারে কিছু করছি না। আমি কয়টা লাকড়ি খড়ি টুকাইতে আইছিলাম। আমি আর কুন দিন আইতাম নারে।'

আমি বললাম, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওটা খুব ভালো কুকুর। চোর-ডাকাত আর খারাপ লোক ছাড়া কাউকে কামড়ায় না।'

'আমি চুর-ডাকাইত না। ইটাগঞ্জ চা বাগানে আমার চাচাতো ভাইর বাসায় বেড়ানিত আইছিলাম। আমারে আফনেরা বাঁচান।'

বাবু বললো, 'তুমি কি লাকড়ি বিক্রি কর?'

'ক্যামনে বেচি? জঙ্গলে লাকড়ি কাটতে গেলে ফারমিশন লাগে। আমি রান্ধার লাগি কয়টা লাকড়ি টুকানিত আইছিলাম। কুত্তাটা আমারে দেখিয়া যে আওয়াজ দিছে শুনিয়া আমি জানের ডরে ওউ জায়গায় লুখাইয়াছিলাম।'

লোকটাকে যে স্ক্যাটরার পছন্দ হয় নি ওর তাকানো দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে গর্‌গর্‌ শব্দ করছিলো। তাতে লোকটা ভয়ে আরো জড়সড় হয়ে পারলে মাটির তলায় ঢুকে যায়। আমি মজা করার জন্যে বললাম, 'তুমি যদি ভালো লোক হতে স্ক্যাটরা তোমাকে দেখে এমন রেগে যেতো না। সত্যি করে বলো কে তুমি? এখানে কি করছিলে?'

লোকটা কি বলতে যাবে, স্ক্যাটরা মৃদু গর্জন করলো—'ঘেউ।' অচেনা কোনো নার্ভাস টাইপের লোকের পিলে চমকাবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। লোকটা হাউমাউ করে বললো, 'আমার কুন দুষ নাই। এক ব্যাটায় আমারে দশ ট্যাকা দিয়া কইছে, গাড়িআলা সাব, বিবি সাবে কিতা কয় না কয় সব্‌ হুনিয়া তার খাছে গিয়া খইতাম।'

লোকটার কথা শুনে বাবুর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো। অবাক আমিও কম হই নি। বলে কি লোকটা! আমাদের ওপর কে ওকে গোয়েন্দাগিরি করতে লাগালো? ধমক দিয়ে লোকটাকে প্রশ্ন করলাম, 'কে তোমাকে টাকা দিয়েছে? কোথায় থাকে সে? কোথায় দেখা করতে বলেছে?'

আমার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরাও বললো, 'ঘেউ।'

আঁতকে উঠে লোকটা বললো, 'তারে আমি চিনি না। আগে কুনদিন দেকছি না! আমরে কইছে ইটাগঞ্জ বাগানের রাস্তার মোড়অ মগরিবের অক্তে যাইতে। আমারে আফনারা ছাড়িয়া দেউকা। আমার কুন দোষ নাই। আর কুনদিন আমি এই কাম করতাম না।'

'তোমাকে এখন ছাড়া যাবে না। লাকড়ি যা কেটেছো ওগুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো।' এই বলে আমি স্ক্যাটরার দিকে তাকালাম—'স্ক্যাটরা, খেয়াল রাখবে লোকটা যাতে পালাতে না পারে।'

স্ক্যাটরা, কটমট করে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঘেউ, ঘেউ।'

লোকটার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হতে লাগলো, ঢোক গিলে কোনো রকমে বললো, 'আমি পলাইমু না।'

লোকটা যে, ঝোপের ভেতর লুকিয়েছিলো, বাবু সেখানে গিয়ে গোছা বাঁধা লাকড়ি দেখতে পেলো। স্ক্যাটরা না থাকলে লোকটা কখনো ওর আসল উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করতো না। যে-ই ওকে পাঠাক, সে নিশ্চয়ই স্ক্যাটরার কথা ভাবে নি। লাকড়ির বোঝাটা এনে লোকটার মাথায় চাপিয়ে বাবু বললো, 'চলো এবার।'

দু'হাতে মাথার বোঝা আঁকড়ে বারবার পেছনে তাকাতে তাকাতে লোকটা আমাদের আগে আগে হাঁটতে লাগলো। স্ক্যাটরা যতক্ষণ আছে, লোকটা কোথাও পালাতে পারবে না। বাবু চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'তোমার কি মনে হয় আবির, লোকটাকে কে পাঠিয়েছে?'

আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। বললাম, 'আমার মনে হয় এর পেছনে পাকড়াশীর হাত থাকতে পারে।'

অচেনা এক লোকের মাথায় লাকড়ির বোঝা চাপিয়ে আমাদের আসতে দেখে নেলী খালা একটু অবাক হলেন। বললেন, 'এইটুকু পথে এতটুকু একটা বোঝা নেয়ার জন্য ফুল-বাবুদের বুঝি কুলি ভাড়া করতে হয়েছে?'

স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে নেলী খালাকে বললো, 'ঘেউ ঘেউ।'

আমি কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'কুলি কাকে বলছো নেলী খালা! একে পাঠানো হয়েছে তোমার আর জাহেদ মামার ওপর নজর রাখার জন্য।'

আমার কথা শুনে ললি টুনি আকাশ থেকে পড়লো। নেলী খালার অবস্থাও ওদের

মতো—'কে পাঠিয়েছে ওকে?'

'বুঝতে পারছি না। সম্ভবত পাকড়াশী।'

ললি অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কোন পাকড়াশী?'

টুনি একটু বিরক্ত হয়ে ললিকে বললো, 'তুমি কয়টা পাকড়াশীকে চেনো ললিপা?' নুলিয়াছড়ির পাজি পাকড়াশীটার কথা মনে নেই?'

নেলী খালা খেই না পেয়ে বললেন, 'একে কিভাবে পেলে খুলে বলো তো সব! আহ্ স্ক্যাটরা, সরো এখন। আমরা সিরিয়াস কথা বলছি।'

স্ক্যাটরা ওর কাজের জন্য একটু আদর পেতে নেলী খালার পায়ে নাক ঘষতেই বিরক্ত হয়ে নেলী খালা ওকে ধকম দিলেন। স্ক্যাটরা মুখ কালো করে আমার কাছে চলে এলো। তারপর কটমট করে লোকটার দিকে তাকাতেই মাথার বোঝা ফেলে এক লাফে সে নেলী খালার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

'স্ক্যাটরাকে বকছো কেন? ও না থাকলে এই শয়তানটাকে বুঝি ধরতে পারতাম! শোন তাহলে—।' লোকটাকে ধরার পুরো ঘটনাটা নেলী খালাকে খুলে বললাম।

সব শুনে নেলী খালা এসে স্ক্যাটরাকে আদর করলেন, 'কি লক্ষ্মী দেখো তো! আমি মিছে-মিছি বকলাম।'

ললি বললো, 'একে এখন কি করবে?'

নেলী খালা বললেন, 'যা করার জাহেদ এসে করবে। এই লোক, ওই গাছটার নিচে গিয়ে বসো। পালাবার চেষ্টা করলে স্ক্যাটরা তোমাকে কুচি কুচি করে ফেলবে।'

স্ক্যাটরাকে কিছুই বলতে হলো না। লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জারুল গাছ-টার নিচে গিয়ে বসলো। স্ক্যাটরা একবার নেলী খালাকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর হেলে-দুলে লোকটার অল্প দূরে গিয়ে সামনের পায়ের ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়লো।

ছবি করার আমন্ত্রণ

স্ক্যাটরার কাণ্ড দেখে আমরা হেসে বাঁচি না। সিড়িঙ্গে লোকটা ভয়ে কাঠ হয়ে স্ক্যাটরাকে

দেখতে লাগলো।

মুখ টিপে হেসে নেলী খালা বললেন, 'এবার কোনো চিন্তা নেই। সবাই এসো, রান্নাটা সেরে ফেলি।'

একটু পরে টুনি গিয়ে লোকটার হাতে দুটো বালতি ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'যাও, পুকুর থেকে পানি নিয়ে এসো।'

লোকটা একবার অসহায় চোখে স্ক্যাটরার দিকে তাকালো। তারপর বালতি হাতে পুকুরের দিকে যেতেই স্ক্যাটরা ওর পিছু নিলো। নেলী খালা বললেন, 'টুনি, ভালো বুদ্ধি বের করেছো তো!'

ফিক করে হেসে টুনি বললো, 'আমরা সবাই কাজ করবো, ও বুঝি বসে বসে খাবে!'

আমরা সবাই লোকটার উপস্থিতি ভুলে গিয়ে পিকনিকের রান্না নিয়ে মেতে উঠলাম। আমি মাটি কেটে দুটো চুলো বানাতে বানাতে বাবু, নেলী খালা মুরগি কেটে বেছে রেডি করলো। ললি টুনি আগে থেকেই তরকারি কুটছিলো। পেঁয়াজ কাটতে বসে ললির চোখের পানি আর নাকের পানিতে একাকার। নিরীহ গলায় টুনি বললো, 'কার জন্য কেঁদে বুক ভাসাচ্ছো লালিপা?'

ললি রুমালে নাক-চোখ মুছে বললো, 'তুমি খুব ফাজিল হয়েছো টুনি।'

বাবু বললো, 'আমি বইয়ে পড়েছি, গেছোনীরা কখনো কাঁদে না।'

'আবার অসভ্য কথা?' এই বলে টুনি উঠে গিয়ে ধুপ করে বাবুর পিঠে একটা কিল বসালো। নেলী খালা তখন অল্প দূরে বসে মাংস ধুচ্ছিলেন বলে এসব দেখতে পেলেন না। ললি বললো, 'তুমি কিছু বললে ভালো কথা আর বাবু বললে বুঝি অসভ্য কথা?'

ললিকে বাবুর পক্ষ নিয়ে বলতে দেখে টুনির মুখ ভার হলো—'ঠিক আছে ললিপা, এখন থেকে তুমি ওদের সঙ্গেই থেকো। আমি রাতেও তোমার সঙ্গে থাকবো না।'

বাবু বললো, 'তোমাদের তো বলা হয় নি, লোকটা নেলী খালাদের বাংলোর কথা কি বলেছিলো!'

বাবুর কথা বলার ধরন দেখে আমি মুখ টিপে হাসলাম। জানি, বাবু এখন বানিয়ে বানিয়ে একটা গপ্পো বলবে। ললি জানতে চাইলো, 'কি বলেছিলো বাবু?'

'নেলী খালাদের বাংলোটা এক বিলেতি সাহেবের, এ কথা তোমরা শুনেছো। তবে সেই সাহেব যে মেমটাকে গুলি করে খুন করে নিজের গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছিলো সে কথা আমাদের ওই লোকটা বলেছে। এখানকার সবাই দেখেছে, প্রতি পূর্ণিমার রাতে মুণ্ডুকাটা এক সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে বাংলোর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, আর মেমটা বাংলোর বারান্দায় হাঁটে।'

'সত্যি লোকটা এসব কথা বলেছে?' ললির কথা শুনে মনে হলো, ও বাবুর কথা বিশ্বাস করেছে।

টুনি শুকনো গলায় বললো, 'আমাদের ওরা ভয় দেখাচ্ছে ললিপা!'

'ওরা বলছো কেন?' হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি কিছু বলেছি?'

ঢোক গিলে ললি বললো, 'তুমি তখন এসব কথা বলো নি কেন?'

'কি জ্বালা! লোকটা যদি কিছু না বলে, আমি কোত্থেকে বলবো?'

'দেখলে তো ললিপা, বাবু কি পাজি!' টুনি আশ্বস্ত হয়ে বললো, 'তুমি তো সব সময় ওর হয়ে আমাকে বকো!'

বাবু করুণ গলায় বললো, 'তোমারা যদি বলো আমি কারো সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারবো না, তাহলে কালই আমি ঢাকা চলে যাচ্ছি।'

ললি অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'বা রে, আমরা কখন বললাম, ঠাট্টা করা যাবে না? তুমি তো জানো, টুনির ভীষণ ভূতের ভয়!'

'তোমর বুঝি কোনো ভয় নেই ললিপা!' টুনি আবার রেগে গেলো—'ঠিক আছে, তুমি থেকো তোমার ঘরে। আমি আবিরদের সঙ্গে থাকবো।'

কেন আবিরদের সঙ্গে থাকবে?' নেলী খালা এসে মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আমি বলে দিয়েছি না, ছেলেরা মেয়েরা আলাদা ঘরে শোবে!'

নেলী খালার কথার ধরন দেখে টুনি ছাড়া আমরা সবাই হো-হো করে হেসে ফেললাম। কোণঠাসা হয়ে টুনি বাবুকে জিব দেখিয়ে ভাব করলো।

সবাই মিলে কাজ করাতে দুপুর একটার মধ্যে আমাদের ডিমের খিচুড়ি, মুরগির মাংস, সবজি ভাজি আর সালাদ তৈরী হয়ে গেলো। ঠিক একটা দশে জাহেদ মামা এলেন নানু আর বড়িবিকে নিয়ে। আমরা ততক্ষণে চাদর ঝেড়ে প্লেট ধুয়ে সাজিয়ে ফেলেছি।

জাহেদ মামা জীপ থেকে নামতে নামতে বললেন, 'খিদে যা লেগেছিলো, খিচুড়ির গন্ধ পেয় ডবল হয়ে গেছে। একি! এ লোকটা কোত্থেকে এসেছে?'

জাহেদ মামার পরনে আর্মির ইউনিফর্ম দেখে লোকটা হাউমাউ করে ছুটে এসে ওঁর পায়ে পড়লো—'আমার কুন দুষ নাই সাব। এই কাম জীবনেও করতাম নায়। এই আমি নাকো কানো ধরছি। আমারে এই কুত্তার আথ থাকি বাঁচাইন।'

জাহেদ মামা অবাক হয়ে বললেন, 'কি করেছে স্ক্যাটরা? ওকে কি কামড়ে দিয়েছে?'

'স্ক্যাটরা ওকে কিছু করে নি। আপনাদের বাঁচিয়েছে পাকড়াশীর গোয়েন্দাগিরি থেকে।' এই বলে আমি পুরো ঘটনাটা আরেক বার বললাম।

'স্ট্রেঞ্জ!' বলে জাহেদ মামা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আপন মনে বললেন, 'পাকড়াশী আমাদের কথা শোনার জন্য এতো ব্যস্ত হবে কেন? মনে হচ্ছে আর কেউ হতে পারে।' এরপর লোকটাকে বললেন, 'মগরের পর্যন্ত তুমি আমাদের কাছে থাকবে। যে লোক তোমাকে টাকা দিয়েছে, তাকে দেখাতে পারলে তুমি ছাড়া পাবে, নাহলে থানায় পাঠাবো।'

লোকটা আশ্বস্ত হয়ে বললো, 'এই কুত্তার থাকি থানা অনেক বালা।'

নানু কম কথা বলেন। সব শুনে তিনি শুধু বললেন, 'খাওয়ার পর আমরা দেরি করবো না। ঘরে ফিরে বিশ্রাম নেয়া যাবে।'

নেলী খালা আদুরে গলায় বললেন, 'আব্বু, আমাদের পিকনিকের কি হবে!'

'পিকনিক আরেক দিন করতে পারবে।' নানু কথা বাড়াতে চাইলেন না।

আমাদের খাওয়ার সময় লোকটাকেও খেতে দেয়া হলো। ওর খাওয়ার ধরন দেখে মনে হলো বহুদিন ভালো কিছু পেটে পড়ে নি। সবাই যথারীতি নেলী খালার রান্নার প্রশংসা করলো। আর নেলী খালাও যথারীতি লালটাল হলেন। স্ক্যাটরাকে মশলা-দেয়া রান্না খাওয়ানো হয় না। ওর জন্য নেলী খালা আলাদা রান্না করেছিলাম। স্ক্যাটরার চেহারা দেখে মনে হলো রান্না ওরও পছন্দ হয়েছে।

সবার খাওয়া শেষ হলে টুনি লোকটাকে দিয়ে এঁটো প্লেট, গ্লাস, হাঁড়ি-পাতিল সব ধোয়ালো। লোকটার চেহারায় ভয় ভয় ভাবটা আর নেই, তার বদলে চোখের ভেতর ধূর্তামির ভাব। নিজে থেকেই কাজ করতে চাইছে। আমি বাবুকে বললাম, 'চারপাশে নজর রেখো, লোকটার সঙ্গে আরো কেউ থাকতে পারে।'

বাবু মৃদু হেসে বললো, 'স্ক্যাটরাকে দেখছো না? ও ঠিকই টের পাবে।'

বড়ো রকমের কাজের দায়িত্ব পেয়ে স্ক্যাটরাকে রীতিমতো গর্বিত মনে হচ্ছিলো। লোক-টার ওপর নজর রাখার সময় মাঝে মাঝে আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলো।

জিনিসপত্র জাহেদ মামা আর বড়িবি গোছালো। সব গাড়িতে তোলার পর নেলী খালা বললেন, 'আমি আব্বু আর বড়িবিকে নিয়ে চলে যাই। গাড়িতে সবার জায়গা হবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'সবার না হলেও জাহেদ মামার নিশ্চয় হবে। জাহেদ মামাকে তুমি নিয়ে যেতে পারো!'

জাহেদ মামা বললেন, 'আমার অবশ্য একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। তোমরা কি পথ চিনে যেতে পারবে?'

'কি যে বলেন!' বাবু আত্মবিশ্বাসের গলায় বললো, 'আমরা ঠিকই পথ চিনতে পারবো।'

টুনি বললো, 'বা রে, আমাদের সঙ্গে স্ক্যাটরা আছে না!'

নানু মৃদু হেসে বললেন, 'জাহেদ, ওরা যখন চাইছে না, তোমার চলে আসা উচিত।'

জাহেদ মামা হেসে বাবুর পিঠ চাপড়ে জীপে গিয়ে বসলেন। জীপটা চোখের আড়াল হতেই লোকটা গোপনে এদিক-ওদিক তাকালো। মনে হলো কারো অপেক্ষায় আছে। স্ক্যাটরা গম্ভীর গলায় একবার 'ঘেউ' বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ভিজেবেড়াল হয়ে গেলো। টুনি নেলী খালার মতো গলা ভারি করে বললো, 'এই লোক, তুমি সামনে হাঁটবে। পালাবার মতলব করলে তোমার কি হবে, সেটা স্ক্যাটরা ভালোমতোই জানে।'

জীপে আসতে যেখানে দশ মিনিট লেগেছিলো, পায়ে হেঁটে বাংলো পৌঁছতে আমাদের সেখানে আধ ঘণ্টার বেশি লাগলো। বাংলোর কাছে এসে দেখি লনে নেলী খালার সঙ্গে বসে গল্প করছেন কিশোর পারেখ আর তাঁর ম্যানেজার বন্ধু। গেটের বাইরে ওদের জীপটা দাঁড় করানো।'

আমাদের দেখেই কিশোরদা ফুর্তিভরা গলায় বললেন, 'আরে এসো এসো, দারুণ কাজ করে ফেলেছো শুনলাম! এই বুঝি সেই স্পাইটা?'

স্পাই বললে সিনেমায় যেরকম স্মার্ট হিরো দেখা যায়, শুঁটকো লোকটাকে মোটেই সের-কম মনে হয় না। টুনি বললো, 'এ মা, এটাকে আপনি স্পাই বলছেন! শুনলে মাসুদ রানারা হার্টফেল করবে।'

বাবু বললো, 'কিশোরদার মতো হ্যাণ্ডসাম না হলে স্পাই মানায় না।'

কিশোরদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কি যে বলো! ওসব বইয়ে আর ছবিতেই হয়। রিয়েল লাইফে স্পাইদের খুব সাদামাটা চেহারার হতে হয়। মনে রাখার মতো চেহারা হলেই বিপদ।'

কিশোরদার বন্ধু মনিদা নেলী খালাকে বললেন, 'এ লোকটাকে থানার দেয়া দরকার, মিসেস আহমেদ।'

আমি বললাম, 'থানায় দেয়ার আগে জানতে হবে কে ওকে টাকা দিয়েছিলো। যে এ কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই নেলী খালাদের ভালো চায় না।'

মনিদা বললেন, 'এই উচ্চিংড়ির কাছ থেকে কথা বের করা কি এমন কঠিন কাজ! আমার হাতে দশ মিনিটের জন্য ছেড়ে দিন, পেট থেকে সব কথা বের করে ফেলবো।'

নেলী খালার ইংরেজিতে বললেন, 'মারধোর করা আমি পছন্দ করি না মিস্টার মুনির। এ ব্যাপারে যা করার জাহেদ এসে করবে।'

হা-হা করে হাসলেন মনিদা—'আমি কি একবারও বলেছি মারধোর করবো! বাগানে আমাকে কুলি চরিয়ে খেতে হয়। কথা বের করার কিছু কৌশল আমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। ফিজিক্যাল টর্চার আমারও অপছন্দ, খুবই প্রিমিটিভ ব্যাপার ওটা।'

আমরা সবাই লনে রাখা বেতের চেয়ারে বসে আছি। লোকটা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে মনিদার কথায় কিম্বা স্ক্যাটরার ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিলো। নেলী খালা মনিদাকে বললেন, 'মারধোর না করে যদি কথা বের করা যায়, করুন।'

মনিদা বললেন, 'সবার সামনে হবে না। আমি ওকে নিয়ে আড়ালে যেতে চাই। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে গেলে অসুবিধে হবে মিসেস আহমেদ?'

'না, অসুবিধে কিসের।' নেলী খালা নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'দেরি করবেন না, আমি চা দিতে বলছি। আপনার বাগানের চা পরখ করে দেখি।'

টেবিলের ওপর দেখলাম পলিথিন ব্যাগে তিন-চার পাউণ্ড চায়ের পাতা। নেলী খালা ব্যাগটা নিয়ে ঘরের দিকে গেলেন। মনিদা লোকটাকে শক্ত গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

ওরা দু'জন চলে যাবার পর কিশোরদা মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা নাকি এ্যাডভেঞ্চার খুব পছন্দ করো? তোমাদের নেলী খালা বলছিলেন, কক্সেস বাজারে তোমরা কিভাবে একটা স্মাগলারকে শায়েস্তা করেছিলে। দারুণ ইণ্টারেস্টিং। শুনে মনে হয়েছে, এ প্লটটা নিয়ে ছোটদের জন্য দারুণ একটা ছবি হতে পারে।'

'সত্যি বলছেন!' চোখ দুটো মার্বেলের মতো গোল গোল করে টুনি বললো, 'ছবিতে কারা এ্যাকটিং করবে? আমাদের নাম থাকবে তো?

'তোমাদের নাম থাকবে না কেন? এ্যাকটিং ও তোমরা করবে, যদি তোমাদের কারো গার্জেনদের আপত্তি না থাকে।'

'ফ্যানটাস্টিক আইডিয়া!' উত্তেজিত গলায় বাবু বললো, 'আমাদের কারো গার্জেনই আপত্তি করবে না।'

মিষ্টি হেসে কিশোরদা বললেন, 'আমি তোমাদের নেলী খালার কাছে ঘটনাটা শুনেই ছবি করার কথা বলেছি। তিনি বললেন, তোমরা চাইলে ওঁর কোনো আপত্তি নেই।'

'আপত্তি কি ভালো কিশোরদা!' বাচ্চাদের মতো খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো টুনি—'ললিপা, কি মজা হবে, তাই না?'

ললি মৃদু হেসে বললো, 'ছবি করার জন্য কি নুলিয়াছড়ি যেতে হবে?'

'মনে হয় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। শ্যুটিং এখানেও হতে পারে। কক্সেসবাজার গিয়ে কিছু প্যাচওয়ার্ক করে নেবো।'

আমি বললাম, 'এখানে ওরকম পুরোনো বাড়ি পাবেন কোথায়?'

'ওটাই প্যাচওয়ার্কের ব্যাপার। এখানকার কয়েকটা ঘর ওরকমভাবে সাজিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তোমরা ছাড়া আর কেউ তো জানে না নুলিয়াছড়ির ঘর-বাড়ি কেমন ছিলো!' কিশোরদার মুখে মিটিমিটি হাসি।

ললি বললো, 'আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো!'

'ছিঃ, ঠাট্টা করবো কেন?' সিরিয়াস গলায় কিশোরদা বললেন, 'বেশ কিছু দিন ধরে ছোটদের জন্য একটা শর্ট ফিচার ফিল্ম করবো ভাবছিলাম। গত বছর বিবিসিও আমাকে বলেছিলো এ নিয়ে ভাবতে। আসলে কানাডা বা আমেরিকায় ওখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছবি করার ব্যাপারে আমি খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। ছোটদের জন্য

ওয়াইল্ড লাইফের ওপর একটা ভেবে রেখেছি, যদিও ওটা ঠিক ফিচার ফিল্ম হবে না। তোমাদের আপত্তি না থাকলে হাতের কাজটা শেষ করেই ওটা শুরু করবো। এই ফাঁকে একটা স্ক্রিপ্টও লিখে ফেলবো। তবে আগেই বলে রাখি, যা ঘটেছিলো হুবহু সেরকম হবে ভেবো না। গল্পের জন্য রদবদল হতে পারে অনেক কিছু।'

বাবু ব্যস্ত হয়ে বললো, 'আপনি যতো খুশি রদবদল করুন, আমাদের মোটেই আপত্তি নেই। টুনির ঝোলানো খোঁপা দুটো যদি মাথার ওপর শিং-এর মতো উঁচিয়ে থাকে, তাহলেও আপত্তি করবো না।'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠে টুনি বাবুকে কিল মারার জন্য চেয়ার থেকে উঠতেই বাবু দৌড় লাগালো। টুনিও দৌড়ালো ওর পেছন পেছন। কিশোরদা হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবুর কথা বলার ধরন আর টুনির এক্সপ্রেশন লক্ষ করেছো আবির? ছবির জন্য দারুণ হবে!'

নেলী খালা ট্রেতে করে চা এনে টুনি, বাবু কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 'টুনি বাবুকে মারার জন্য তাড়া করছে। ওরা এখন চা খাওয়া পছন্দ করবে না। কিশোরদা কি বলছেন, জানো নেলী খালা?'

'জানি, ছবি করার কথা তো? সবাই রাজি হলেও জাহেদ নিশ্চয়ই অভিনয় করতে রাজি হবে না।'

'ওটাও আমি ভেবে রেখেছি।' হাসতে হাসতে কিশোরদা বললেন, 'এ ছবি করার জন্য আমাকে ঢাকা থেকে এক জন ক্যামেরাম্যন, দু'-তিনজন এ্যাসিসটেন্ট আর কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে। আমি ঠিক করেছি আপনি আপত্তি না করলে মেজর জাহেদের পার্টটা আমিই করবো।'

নেলী খালা অপ্রস্তুত হলেন—'অভিনয়ের ব্যাপার, আপত্তির কি আছে!'

নেলী খালার কথা শেষ না হতেই দেখি মনিদা লোকটাকে নিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে বেরুলেন। এতোক্ষণ স্ক্যাটরাও ওখানে বসে ছিলো। লোকটাকে দূরে বসিয়ে মনিদা এসে ওর চেয়ারে বসলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'লোকটা সম্ভবত কিছুই জানে না মিসেস আহমেদ।'

কিশোরদা প্রশ্ন করলেন, 'সম্ভবত বলছিস কেন মনি?'

'বলছি এ জন্যে, বারবার সে একই কথা বলেছে। আমি যে পদ্ধতিতে কথা বলি, সাধারণ নার্ভের লোক এতোক্ষণ স্টিক করতে পারে না। লোকটা হয় ইনোসেন্ট—পয়সার জন্য এমন কাজ করতে রাজি হয়েছে। নাহলে বলতে হবে বড়ো ধরনের কোনো অভিনেতা। থানায় নিয়ে আদিম পদ্ধতিতেই কথা বের করতে হবে। মিসেস চৌধুরীর পছন্দ-অপছন্দকে পুলিশের লোকেরা গুরুত্ব নাও দিতে পারে।'

'তাহলে থানায় দেয়ার দরকার নেই।' নেলী খালা বললেন, 'আমারও মনে হয় লোকটা তেমন কিছু জানে না।'

আমি বললাম, 'থানায় দিলে পুলিশ অবশ্য চেক করে দেখতে পারতো লোকটা তার যে পরিচয় বা ঠিকানা দিয়েছে সেটা সত্যি কিনা।'

'পরিচয় মিথ্যে বলে নি।' মনিদা বললেন, 'ওটা আমি যাচাই করে নিয়েছি। লোকটা ইটাগঞ্জ টী এস্টেটের কথা বলেছে, ওটা আমারই বাগান। আজ সন্ধ্যায় ওকে ছেড়ে নজর রাখলেই হবে কে আসে ওর কাছে।'

'তোর এ আইডিয়াটা মন্দ নয়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কিশোরদা বললেন, 'আশা করি মেজর জাহেদ এ বিষয়ে আপত্তি করবেন না।'

'না না, আপত্তি করবে কেন? আসলে কদিন ধরে জাহেদ এতো ব্যস্ত যে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ওর নেই। লোকটার ওপর নজর রাখার ব্যাপারে বাবুরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।' এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে নেলী খালা মুখ টিপে হাসলেন।

মনিদা একটু ভেবে বললেন, 'আমার মনে হয় বাবুদের এ কাজে জড়ানো ঠিক হবে না। অচেনা লোকজন দেখলে কেউ যদি আসার কথা ভেবে থাকে, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে। আমি বরং আমার গার্ড দুটোকে বলবো দূর থেকে লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে।'

'ওকে কি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান?' জানতে চাইলেন নেলী খালা।

'আপনার আপত্তি না থাকলে নিয়ে যেতে পারি। যদি অন্যরকম কিছু দেখি, রাতে আপা-নাদের সঙ্গে না হয় যোগাযোগ করবো।'

কিশোরদা বললেন, 'আজ তাহলে উঠি মিসেস আহমেদ। যে কদিন আছি মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো। আর আপনি কিন্তু জাহেদ সাহেবকে আমার শ্যুটি-এর ব্যাপারে বলবেন। কাল সকালে অফিসে ওঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, বলবো।'

লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে কিশোরদারা চলে গেলেন। নেলী খালা আমাকে বললেন, 'টুনি, বাবু বেড়াতে বেরিয়েছে, তোমরাও না হয় কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এসো। দূরে কোথাও যেও না।'

ললি মিষ্টি হেসে বললো, 'স্ক্যাটরাকে নিয়ে যাই?'

'ওকে কি রেখে যেতে পারবে? 'হাসতে হাসতে নেলী খালা বললেন, 'বেড়ানোর সুযোগ পেলে ও আর কিছু চায় না।'

লাল পাহাড়ের হৃৎকম্পন

নানু সময় বেঁধে দিয়েছেন, রাতের খাওয়া ন'টার মধ্যে টেবিলে দিতে হবে। আমরা যখন খেতে বসেছি, জাহেদ মামা তখনো আসেন নি। খেতে খেতে নেলী খালাকে নানু

জিজ্ঞেস করলেন, 'কদিন ধরে জাহেদ রাত করে ফিরছে—কিছু বলেছে তোমাকে?'

নেলী খালা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কাজের চাপ বেড়েছে।'

'রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত এত কি কাজ?'

'হঠাৎ করে এদিকটায় সন্দেহজনক লোকের আনাগোনা বেড়েছে। পরশু দু' জন ধরাও পড়েছে। ইণ্ডিয়া থেকে নাকি এসেছে।'

'পলিটিক্যাল এলিমেণ্ট না স্মাগলার?'

'জাহেদ এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে বেশি আলোচনা করে না।'

'ওকে সাবধানে থাকতে বলো।' এই বলে নানু খাওয়া শেষ করে টেলিল ছেড়ে উঠেছেন, তখনই জাহেদ মামা এলেন। বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো ওঁকে। সোজা এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসে গেলেন। বললেন, 'দারুণ খিদে পেয়েছে। দুপুরের পর এক কাপ চাও জোটে নি। তারপর? আবিরদের গোয়েন্দাগিরির সর্বশেষ খবর কি?'

'কোন গোয়েন্দাগিরি?' আমরা চারজন অবাক হলাম।

'কেন, সকালে যে এক গুপ্তচর ধরলে! কার হয়ে ও কাজ করছে, সে সব খবর তদন্ত করে বের করার কথা না?'

আমি বললাম, 'ও কাজটার দায়িত্ব ইটাগঞ্জ টী এস্টেটের ম্যানেজার মুনির সাহেব নিয়েছেন। জেরা করে কিছু পাওয়া যায় নি। সঙ্গে নিয়ে গেছেন, সন্ধেবেলা নজর রাখবেন কেউ ওর কাছে আসে কিনা দেখার জন্য।'

'আপদ গেছে।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন জাহেদ মামা। তারপর জানতে চাইলেন, 'মুনির সাহেব কখন এসেছিলেন।'

'দুপুরের ঠিক পরেই।' জবাব দিলেন নেলী খালা। 'তুমি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নামিয়ে দিতে এলে দেখা পেতে।'

টুনি চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'কিশোর পারেখও এসেছিলেন।'

'তাই নাকি!' মৃদু হাসলেন জাহেদ মামা। 'সকালে দু' বার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ছবির শ্যুটিং-এর জন্য স্পট খুঁজছিলেন। ভারি অমায়িক লোক।'

'তিনি আমাদের নুলিয়াছড়ির এ্যাডভেঞ্চার নিয়ে ছবি করবেন।' টুনির চেয়ে বাবু কম উত্তেজিত নয়।

টুনি বললো, 'আমরা সবাই সে ছবিতে অভিনয় করবো।'

'তবে তো আর কথাই নেই।' হাসলেন জাহেদ মামা।

'নেলী খালাও থাকবেন সে ছবিতে?' টুনি আগের মতো উত্তেজিত।'

'নাকি!' বড়ো বড়ো চোখ করে নেলী খালার দিকে তাকালেন জাহেদ মামা। ঠোঁটের ফাঁকে মিটি মিটি হাসি—'তোমাদের জাহেদ মামার পার্টটা কে করবে শুনি?'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'তোমাকে করতে কেউ বারণ করছে নাকি!'

'পাগল নাকি!' এক কথায় উড়িয়ে দিলেন জাহেদ মামা। 'কাগজে আমাদের ছবি ছাপা পর্যন্ত বারণ।'

কথাটা জাহেদ মামা মিথ্যে বলেন নি। নুলিয়াছড়িতে পাকড়াশীর দলবল যখন ধরা পড়লো, তখন শুধু আমাদের চার জনের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিলো। বাবু বললো, 'আপনি এ্যাকটিং না করলে কিশোরদা আপনার রোলে এ্যাকটিং করবেন।'

'ভালো বুদ্ধি বের করেছে তো কিশোর পারেখ!' এই বলে জাহেদ মামা আড়চোখে তাকালেন নেলী খালার দিকে।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে চাপা গলায় নেলী খালা বললেন, 'আহ্, ছোটদের সামনে এসব কি কথা।'

জাহেদ মামা প্রসঙ্গ পাল্টে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আবিররা শোন, তোমরা চার জন যখন একত্র হয়েছো, তোমাদের ঘরে আটকে রাখা যাবে না জানি। তবে এখানে কয়েকটা জায়গা আমরা সিভিলিয়ানদের জন্য রেস্ট্রিকটেড করে দিয়েছি। পুব দিকে মাইল চারেক গেলে ইণ্ডিয়ার বর্ডার। বর্ডারের এক মাইলের ভেতর যাবে না। উত্তর দিকে একটা জিওলডিক্যাল টীম এসেছে সার্ভে করতে, ওদের সার্ভে এরিয়ার দু' মাইলের ভেতর যাওয়া নিষেধ। এ ছাড়া আমাদের ক্যাম্প এরিয়ায় সিভিলিয়ানদের ঢোকা বারণ।'

নেলী খালা বললেন, 'কাল সকালে কিশোর পারেখ তোমার অফিসে যাবে।'

'কেন?' জানতে চাইলেন জাহেদ মামা।

'শ্যুটিং-এর পারমিশন চাইতে বোধ হয়।'

'রেস্ট্রিকটেড এরিয়ার বাইরে হলে শ্যুটি করতে পারে।'

আমি লক্ষ করলাম, খেতে বসে আমাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করলেও জাহেদ মামাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। খাওয়ার পর জাহেদ মামা ওঁর ঘরে চলে গেলেন। আমরা চার জন বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস বারান্দায় রেলিং অব্দি ঝোলানো বাঁশের চিকের পর্দার ফাঁক দিয়ে এসে মাঝে মাঝে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিলো। আমাদের সবার গায়ে মোটা জ্যাকেট আর পুলোভার। ললির গলা ব্যথা করছিলো—সন্ধের পরই ও হাতে-বোনা উলের মাফলার জড়িয়েছে।

বিকেলে আমি আর ললি হাঁটতে হাঁটতে সকালের সেই পুকুরটার কাছে চলে গিয়েছিলাম। সন্ধে পর্যন্ত বসেছিলাম অর্কিড-ভরা গাছটার নিচে। অনেক কথা হয়েছে। ললি ওদের সব কথা আমাকে বলেছে। ওর বাবার কথা বলেছে, মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে যিনি আর ফিরে আসেন নি। ওর মার ধারণা, একদিন তিনি ঠিকই ফিরে আসবেন।

হঠাৎ কিছু করে সবাইকে চমকে দেয়া পছন্দ করতেন ললির বাবা। পোর্টের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মার্চে লণ্ডন যাওয়ার কথা ছিলো ট্রেনিং-এ, যান নি। পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা যেদিন রেডিওতে শুনলেন, তার ঠিক বারো দিন পর চলে গেলেন যুদ্ধে। ললি টুনিরা তখন ফাইভ সিক্সে পড়ে। স্কুল বন্ধ ছিলো, বিকেলে মার সঙ্গে ওরা বাগানের লনে বসে আছে, বাবা এসে বললেন, চলি রে মেয়েরা, মার কাছে লক্ষ্মী হয়ে থাকিস।

মা বোধ হয় আগে জানতেন, বাবাকে কথা দিয়েছিলেন কাঁদবেন না, তাই শক্ত হয়ে বসে রইলেন। ললি টুনি বললো, কোথায় যাচ্ছো বাবা, কবে আসবে? বাবা বললেন, যুদ্ধে যাচ্ছি, দেশ স্বাধীন করে ফিরবো। ভয় পাস্ নে, তোদের মা সব ঠিকমতো সামলাতে পারবেন। আমিও তোদের খোঁজখবর নেবো। গেটের বাইরে বাবার বন্ধু হাবিব চাচা দাঁড়িয়েছিলেন, বাবাকে তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। ললি, টুনিকে কোলে তুলে কপালে চুমু খেয়ে আদর করে বাবা চলে গেলেন।

যুদ্ধের নয় মাস ওরা পোর্টের বাংলোতেই ছিলো। মা ফিনলে কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ছিলেন। টাকাপয়সার কোনো অসুবিধে কখনো হয় নি। বাবার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে ওরা বলতো লণ্ডন গেছেন। অফিসও জানতো ওদের বাবা ট্রেনিং-এর জন্য এক

বছর লণ্ডন থাকেবেন। মাঝে মাঝে অচেনা ছেলেরা বাবার চিঠি আনতো, মার জন্য আলাদা, ললি টুনির জন্য আলাদা।

ওদের আশেপাশের বাড়ির সবাই গ্রামে চলে গিয়েছিলো। গোটা পাড়াটা খাঁ-খাঁ করতো। অফিসের গাড়ি এসে সকালে মাকে নিয়ে যেতো, বিকেলে পৌঁছে দিতো। সারা দিন ললি টুনি ভাবতো, এই বুঝি বাবা এলেন। ওদের বুড়ি দাইআম্মা লুকিয়ে কাঁদতো বাবার জন্য। বাবাকে নাকি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

সেবার নভেম্বরের শেষের দিকে ছিলো ঈদ। বাবার জন্য সবার মন খারাপ। মা এমনিতে কম কথা বলেন, বাবা চলে যাওয়ার পর আরো চুপচাপ হয়ে গেছেন। ঈদের আগের দিন রাতে—ওরা যখন ঘুমোতে যাবে, এমন সময় ড্রইংরুমের দরজায় টোকা পড়লো। শব্দ শুনেই ওরা বুঝলো বাবার চিঠি এসেছে। মা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখেন বাবা দাঁড়িয়ে।

ওঁকে অন্যরকম লাগছিলো। গালভর্তি দাড়ি, আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছেন, গায়ের ফর্সা রং তামাটে হয়ে গেছে—ছুটে এসে ললি টুনিকে কোলে তুলে নিলেন। মা দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে জানালার কাঠের পাল্লা সব টেনে বন্ধ করলেন। সারা রাত ওরা কেউ আর ঘুমায় নি। দাইআম্মা সেই রাতে বাবার জন্য পোলাও, কোর্মা আর পায়েস রান্না করলো। বাবা এমনভাবে খেলেন, যেন কতদিন পেট পুরে খান নি। সারা রাত যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে শেষরাতে ললি টুনি বাবাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে, বাবা নেই। মা বললেন, এক মাসের মধ্যেই নাকি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, বাবা ফিরে আসবেন। মার প্রথম কথাটা সত্যি ছিলো, শেষেরটা নয়। বাবার সঙ্গে যারা যুদ্ধে গিয়েছিলো তাদের অনেকে ফিরেছে অনেকে ফেরে নি। কার কাছে খবর নেবে, হাবিব চাচাও ফেরেন নি। পোর্টের যাঁরা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, সরকার তাঁদের পরিবারকে অনেক সাহায্য দিয়েছেন। মা সে সব নেন নি। পোর্টের কয়েকজন বড়ো অফিসার জানতেন, ললিদের বাবা যে লণ্ডন যাওয়ার বদলে যুদ্ধে গেছেন। তাঁরা মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওঁর কি প্রয়োজন। মা বলেছেন—বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ বাড়িটায় থাকতে চান, আর কিছু নয়। এরপর তিন বছর কেটে গেছে, বাবা ফেরেন নি। মার মতো ললি টুনিও বিশ্বাস করে বাবা সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন চলে আসবেন, সেবার ঈদের আগের রাতে যেমন এসেছিলেন।

আমি চুপচাপ বারান্দায় বসে ললির কথা ভাবছিলাম। বাবুকে টুনি কি যেন বললো শুনতে পেলাম না। ও উঠে গিয়ে ললি টুনির জন্য আনা পুতুল আর চকলেটের বাক্সটা এনে ওদের হাতে দিলো। টুনি চকলেটের বড়ো বাক্সটা দেখে দারুণ উত্তেজিত। বললো, 'ললিপা, এটা আমরা বাড়ি নিয়ে যাবো। মা খুব খুশি হবে। কি দারুণ দেখতে, তাই না?'

বাবু বললো, 'পুতুল বুঝি পছন্দ হয় নি, কত খুঁজে খুঁজে আনলাম।'

'ইস, পছন্দ হবে না কেন? এটা আমার জান!' এই বলে পুতুলটাকে চুমু খেলো টুনি।

বাবু করুণ গলায় বললো, 'বা রে, শুধু পুতুলটাই বুঝি জান হলো। যে এতো কষ্ট করে পুতুলটা আনলো, সে বুঝি একেবারে ফ্যালনা।'

বাবুর কথা বলার ধরন দেখে টুনি হেসে ফেললো—'তুমিও জান, ললিপাও জান, আবিরও জান। তবে এটা বেশি জান। 'এই বলে ও আবার চুমু খেলো পুতুলটাকে।

ললিও হাসতে হাসতে বললো, 'চমৎকার পুতুল এনেছো বাবু।'

ললি টুনিকে হাসতে দেখে আমার খুব ভালে লাগলো। টুনি বললো, 'আবির, আপনার জন্য বাবু কি এনেছে?'

'একটা কোটপিন আর দুটো বই।

'ব্যাস!' অবাক হলো টুনি—'আর কিছু আনে নি?'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি তো আর ওর জান নই। আমার জন্য আর কি আনবে!'

আমার কথা শুনে এবার বাবুর হাসার পালা—'দেখো আবির, এভাবে বলছো কেন? তোমার একটা বইয়ের দামে দুটো পুতুল পাওয়া যায়!'

নিরীহ গলায় বললাম, 'আমি কি বলেছি কম দামী বই এনেছো?'

'আমাদের পুতুলই ভালো, তাই না ললিপা?' বলে পুতুলটাকে আরেক দফা চুমু খেলো টুনি।

হঠাৎ বাবু চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—'আবির, ওই দিকে দেখো।' আঙুল তুলে ও সামনের দিকে দেখালো।

তাকিয়ে দেখি স্টিমারের সার্চ লাইটের মতো একটা আলোর সাদা রেখা কালো অন্ধকারকে চিরে এপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে হঠাৎ নিভে গেলো। আমি বললাম, 'আর্মি ক্যাম্পের কেউ বোধ হয় সার্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখছে।'

ললি চাপা গলায় বললো, 'জাহেদ মামাদের ক্যাম্প ওদিকে নয় আবির। ওদিকে বর্ডার। ওটা পুব দিক। ক্যাম্প হচ্ছে আমাদের পশ্চিমে।'

'বর্ডারে কে সার্চ লাইট জ্বালাবে!' ভীষণ অবাক হলাম আমি।

টুনি বললো, 'কেন, নুলিয়াছড়িতে দেখো নি। গুণ্ডোরা সার্চ লাইট জ্বালিয়ে সিগন্যাল দেয়।'

'আহ্ টুনি!' ললি ওকে চাপা গলায় ধমক দিলো—'এটা নুলিয়াছড়ি নয়। বর্ডারের ওদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। জাহেদ মামা বলেছেন, ওদিকে মানুষজন কেউ থাকে না।'

'তবে আলো দেখালো কে!' এই বলে টুনি হঠাৎ ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'ললিপা, তুমি ভয় দেখাচ্ছো কেন, মানুষ না থাকলে আলো কে দেখাবে?'

বাবু টুনিকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেয়ে বললো, 'মানুষ ছাড়া আর কেউ বুঝি আলো দেখাতে পারে না? এসব পুরনো জঙ্গলে কত কি থাকে!'

টুনি ললির গা ঘেঁষে বসলো—'বাবু, ভালো না বলছি।'

আমি বললাম, 'বাবু, এটা কোনো মজার ব্যাপার নয়। আলো মানুষই জ্বেলেছে। আমাদের জানা দরকার ওরা খারাপ লোক না ভালো লোক।'

বাবু হালকা গলায় বললো, 'কাল সকালে জাহেদ মামাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। হতে পারে ওদের কোনো দল কিছু খুঁজতে বর্ডারের দিকে গেছে।'

'হতে পারে! তবে অন্য কিছুও হতে পারে।'

'কাল সকালে আমরা নিজেরা গিয়েও দেখতে পারি।' আস্তে আস্তে কথাটা বললো ললি।

'দারুণ আইডিয়া!' বাবু উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার চুপসে গেলো—'জাহেদ মামা যে বলেছেন বর্ডারের ওদিকে যাওয়া বারণ।'

'অতদূর কে যাচ্ছে! আমরা দুপুরের আগে ফিরে আসবো।' এই বলে ললি আমার দিকে তাকালো—'আবির কি বলো?'

'আমিও ঠিক তাই ভাবছি।' ললির কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'কিছু যদি নাও পাই,

বেড়ানো তো হবে!'

সকালে জাহেদ মামার সঙ্গে দেখা হলো না। আমরা ঘুম থেকে উঠেছি আটটায়, তার আগেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। নাশতা খাওয়ার সময় নেলী খালা বললেন, 'টের পেয়েছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত তোমরা বারান্দায় বসে গল্প করেছো, তাই ভোরে ঘুম ভাঙাই নি!'

'নেলী খালা, কাল রাতে আমরা—' উত্তেজিত গলায় টুনি আলো দেখার কথা বলতে যাচ্ছিলো, ললির চিমটি খেয়ে ওর মনে পড়লো কাল রাতে আমরা ঠিক করেছিলাম এ কথা কাউকে বলবো না।

নেলী খালা অবাক হয়ে বললেন, 'কাল রাতে তোমরা কি টুনি?'

'ললিপা, তুমি বলো।' মুখ কালো করে বললো টুনি।

ললি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কিশোর পারেখের ছবির গল্প করছিলাম।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, পাকড়াশীর পার্ট কে করবে কিশোরদাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

শুধু পাকড়াশী কেন, লরেল হার্ডির মতো ফতে গোবররা আছে না? কম পাজি ছিলো নাকি ও দুটো!'

নেলী খালার কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বারান্দায় বসে ছিলো স্ক্যাটরা। কোরাসে হাসি শুনে বললো, 'ঘেড়।'

নাশতা খেয়ে তৈরী হয়ে নেলী খালাকে যখন বেড়াতে যাবার কথা বললাম—শুনে শুধু মুখ টিপে হাসলেন। টুনি ছুটে গিয়ে নেলী খালাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে বললো, 'তুমি কতো ভালো নেলী খালা!'

টুনির দেখাদেখি স্ক্যাটরাও এসে নেলী খালাকে আদর করলো। নেলী খালা বললেন, 'দুপুরের আগে ফিরে এসো।'

আমাদের সঙ্গে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে স্ক্যাটরা মহা উত্তেজিত। কাঠবেড়ালি দেখলেই ও ছুটে যায় ধরতে। প্রজাপতি দেখলেও ওদের পেছনে ছুটবে। ধরতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে বোকা মুখ করে চোরের মতো আড়চোখে তাকাবে। ওর কাণ্ড দেখে আমরা হেসে বাঁচি না।

আমরা হাঁটছিলাম বর্ডারের দিকে। প্রথমে ছিলো হালকা গাছপালা আর এখানে সেখানে ছোট বড়ো ঝোপঝাড়। তারপর ধীরে ধীরে গাছগুলো ঘন আর বড়ো হতে লাগলো। এক ঘণ্টা হাঁটার পর মনে হলো আমরা জঙ্গলের বেশ ভেতরে ঢুকে গেছি। ঘড়িতে দেখি মাত্র দশটা বাজে। এখানে সেখানে ছিটেফোঁটা রোদের কণা। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। শুকনো পাতা মাড়িয়ে আমাদের হাঁটার শব্দ ছাড়া জঙ্গলে আর কোনো শব্দ নেই। এমনকি পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিলো না।

বাবুকে বললাম, 'লক্ষ করেছো, কিছুক্ষণ আগেও অনেক পাখির ডাক শুনেছি। কাঠবেড়ালিদের দেখেছি ছুটোছুটি করতে। এদিকে দেখো, কোনো কিছুর সাড়াশব্দ নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ মনে হলো বহু দূরে অদ্ভুত ধরনের একটা শব্দ। চাপা গলায় বললাম, 'একটু দাঁড়াও তো!'

আমার কথা শুনে সবাই থমকে দাঁড়ালো। বাবু বললো, দাঁড়াতে বললে কেন, কিছু শুনতে পেয়েছো?'

আমি ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বললাম। স্ক্যাটরাও কান খাড়া করলো। মনে হলো বহু দূরে আবছা একটা গম্ভীর শব্দ—ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ।

ওরা সবাই শুনলো সেই শব্দ। সবার চোখে মুখে প্রশ্ন। স্ক্যাটরা গর্‌গর্‌ করে উঠলো। ললি আস্তে বললো, 'গ্রামে ধানের কলে অনেকটা এরকম শব্দ হয়।'

বাবু চিন্তিত গলায় বললো, 'এদিকে গ্রাম কোথায়?'

'ধানের কলের শব্দ নয় ললি।' আমি মাথা নাড়লাম—'খেয়াল করে দেখো, বেশ ভারি আর গম্ভীর শব্দ।'

বাবু বললো, 'চলো না, সামনে গিয়ে দেখি। জাহেদ মামা বলছিলেন, কোন জিওলজিক্যাল টীম এসেছে। ওদের সার্ভে করার কোনো মেশিন-টেশিনের শব্দ হতে পারে।'

বাবুর কথা মতো আমরা চার জন সমনের দিকে এগুলাম। স্ক্যাটরাও সতর্ক হয়ে কান খাড়া করে হাঁটছে। আমি একটা গাছের শক্ত ডাল ভেঙে হাতে নিলাম। স্ক্যাটরা যতক্ষণ সঙ্গে আছে ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই। তবু বলা যায় না, জঙ্গলের ভেতর সাপ-খোপও তো থাকতে পারে।

আমরা যতো সামনের দিকে হাঁটছিলাম ধুপ-ধুপ শব্দটা ততো জোরালো হচ্ছিলো। গাছপালা একটু ফাঁকা হতেই সমনে তাকিয়ে দেখি উঁচু পাহাড়ের মতো। দূর থেকে মনে হয়েছিলো জঙ্গলের মতো। পাহাড়ের গায়ে ঝোপঝাড় ভর্তি, দূরে দূরে একটা দুটো আধ-মরা গাছ। শব্দের উৎস মনে হলো পাহাড়ের উল্টোদিকে। একটানা ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ ভারি আর গম্ভীর শব্দ। যেখান থেকেই আসুক, মনে হচ্ছিলো পাহাড় ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

আমরা শব্দের উৎস খুঁজে বের করার জন্য পাহাড়টাকে ডান দিকে রেখে উত্তর দিকে হাঁটলাম। হঠাৎ দেখি জঙ্গল শেষ হয়ে গভীর ঢাল নেমে গেছে। দেখে মনে হয়ে মাটি কেটে বুঝি চওড়া নালার মতো ঢালটুকু বানানো হয়েছে। আরো কাছে গিয়ে দেখি মাটি কাটা হয়েছে পাহাড়ের গা থেকেও। লালচে কমলা রঙের মাটি। সবুজ পাহাড়ের শরীর আর ঘন জঙ্গলকে কেউ যেন বিশাল এক ছুরি দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সবুজের ভেতর চেঁছে ফেলা জায়গাটুকু ক্ষতচিহ্নের মতো দগদগ করছে। মাটি ফুঁড়ে শব্দ বেরুচ্ছে ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ। আমরা চার জন হতভম্ব হয়ে ঢালের কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলাম। স্ক্যটরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

বাবু চাপা গলায় বললো, 'শব্দটা ঠিক পাহাড়ের ভেতর থেকে আসছে।'

আমি বললাম, 'লক্ষ করে দেখো, ঠিক হার্টবিটের মতো মনে হচ্ছে।'

সবজান্তার মতো বাবু বললো, 'এগুলোকে বলে জীবন্ত পাহাড়।'

'জীবন্ত পাহাড় মানে কি?' ভয় পাওয়া গলায় ফিসফিস করে জানতে চাইলো টুনি।

'এ ধরনের পাহাড়কে 'আগ্নেয়গিরি বলে। মনে হচ্ছে এখান দিয়ে কখনো লাভার স্রোত নেমেছিলো।'

'না বাবু!' মাথা নাড়লাম আমি। 'লাভা যদি নামতো তাহলে শক্ত হয়ে জমে থাকতো। যাকে বলে আগ্নেয়শিলা। এখানে পরিষ্কার কাঁচা মাটি দেখা যাচ্ছে।'

'তাহলে শব্দটা কিসের? কাল রাতে আলোই বা কে দেখালো?' জানতে চাইলো বাবু।

'বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি কোনো আলোকপাত করতে পারলাম না।

ললি বললো, 'কেমন বাজে একটা গন্ধ পাচ্ছি! আবির ফিরে চলো, আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

ললির কথা শুনে গন্ধটা আমরাও অনুভব করলাম। পোড়া গন্ধকের মতো ভারি আর অস্বস্তিকর একটা গন্ধ বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিলো। ললির কথা শেষ না হতেই টুনি বললো, 'আমারও খুব খুরাপ লাগছে ললিপা। এখান থেকে শিগগির চলো।'

'চলো তাহলে। এই বলে আমরা যে, পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথে বাংলোতে ফিরে এলাম। সারা পথ কেউ কোনো কথা বলে নি। এমনকি স্ক্যাটরা পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলো। ফেরার পথে এতো প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালি—কাউকে ও কিছু বললো না।

মনিপুরী দিদিমার আস্তানায়

বিকেলে লনে বসে লাল পাহাড়ের ভৌতিক শব্দের ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমরা চার জন। বাবু এক বার বললো, 'পাহাড়ের ভেতর নিশ্চয় কেউ পাকড়াশীর মতো গোপন আস্তানা বানিয়ে বসে আছে।'

'আস্তানা যদি গোপন হবে, তাহলে ওরা শব্দ করবে কেন?'

ললি বললো, 'পাহাড়ের ওপাশটায় তো আমরা যাই নি। হতে পারে সেখানে কোনো যন্ত্র বসিয়েছে সার্ভে টীমের লোকেরা।'

'আমিও তো তাই বলছিলাম। বাবু ওর মতের সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললো, 'জাহেদ মামা এলেই জিজ্ঞেস করবো, কাল আমরা ওদের কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা।'

জাহেদ মামা দুপুরে খেতে আসেন নি। নেলী খালার মনও যে ভালো নেই টের পেলাম—যখন তাঁর বদলে বড়িবি এলো আমাদের চা নিয়ে। বড়িবিকে দেখেই কথাটা মনে পড়লো আমার। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বড়িবি, এখানকার লোকজনদের কারো সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?'

বড়িবি বললো, 'কিছু কিছু আদমির সাথে বাতচিত হয়। সাভারে দুধ দেয় বাসন্তী গোয়ালিনী। তার বাদে ধোবি আসে। হামার খাঁসির জন্য বাসন্তী মনিপুরী দিদিমার কবচ এনে দেবে। বলে জাদুর মাফিক কাজ করে।'

'কাল ওরা এলে জিজ্ঞেস করবে তো, এখানকার পুরনো লোক কারা। আমি তোমার কাশির জন্য ভালো একটা দাওয়াই দেবো।'

'ঠিক আছে ছোটে সাব। দাওয়াই কখুন দিবে?'

'দাঁড়াও তাহলে।' এই বলে আমি এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে আমার ব্যাগ থেকে চারটা স্ট্রেপসিল লজেন্স বের করলাম। মা বলেছেন, গলা খুশখুশ করলে খেতে। বড়িবি ওর কাশির জন্য এমন কোনো ওষুধ নেই যে খায় নি। এখন তাবিজ কবচ পরতে চাইছে বেচারা।

ওষুধ পেয়ে ও খুব খুশি। বললো, 'কখুন খাবো? পানিতে গুলে না গিলে খাবো?

'যখন কাশি আসবে লজেন্সের মতো চুষে খেও, ভালো লাগবে।'

'আল্লা তোমার ভালো করবেন। তোমার দিলে বহুত রহম আছে ছোট সাব।' এই বলে বড়িবি চলে গেলো।

'পুরোনো লোক দিয়ে কি করবে তুমি?' জানতে চাইলো বাবু।

'হয়তো বলতে পারবে পাহাড়ে কেউ কখনো মাটি কেটেছিলো কিনা, কিম্বা শব্দটা কেন হয়।'

আমাদের চা খাওয়া শেষ না হতেই কিশোরদা আর মনিদা এসে হাজির। স্ক্যটরা কাল ওদের চিনে ফেলেছিলো, তাই কিছু বললো না। কিশোরদা হালকা গলায় বললেন, 'আমরা বোধ হয় একটু দেরি করে ফেলেছি আবির!'

'কিসের দেরি?' আমি একটু অবাক হলাম।

'একটু আগে এলেই চা-টা পাওয়া যেতো।'

'আমি এক্ষুণি চায়ের কথা বলছি।' এই বলে টুনি একছুটে রান্নাঘরের দিকে গেলো।

বাবু ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলো, 'কালকের সেই লোকটার ব্যাপারে কিছু জানা গেলো মনিদা?'

'ন্না!' মাথা নাড়লেন মনিদা—'সন্ধের আগে ওকে রাস্তার ওপর ছেড়ে আরো দশ টাকা দিয়ে বলেছি, যে-লোকটা ওকে টাকা দিয়েছিলা সে এলে যেন মাথা চুলকে ইশারা করে। আমরা একটু দূরে আড়ালে বসে আছি। লোকটা এক ঘণ্টা পায়চারি করলো, কেউ এলো না। তারপর অন্ধকার হতেই লোকটা হাওয়া হয়ে গেলো।'

আমি বললাম, 'তার মানে, যে টাকা দিয়েছে সে নিশ্চয়ই জেনে গেছে লোকটা যে আমা-দের হাতে ধরা পড়েছে।'

'ভীষণ ধড়িবাজ লোক।' মনিদা বললেন, 'কাল ওর বাড়ির যে-ঠিকানা দিয়েছিলো, সকালে আমার এক চৌকিদার পাঠিয়েছিলাম সেখানে। চৌকিদার বললো, ওখানে ওই নামে কেউ থাকে না।'

কিশোরদা সামান্য অভিযোগের গলায় বললেন, 'তুমি লোকটাকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলে মনি।'

যা ঘটেছে এর জন্য মনিদাকে দায়ী করা যায় না। আমরা থাকলেও একই ঘটনা ঘটতে পারতো। স্ক্যাটরা থাকলে তার কথা অবশ্য আলাদা। তবে লোকটার চেয়ে আমি বেশি ভাব-ছিলাম পাহাড়টার কথা। মনিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কখনো বর্ডারের ওদিকে গিয়েছিলান?'

'ন্না। কেন?'

'আজ সকালে গিয়েছলাম। পাহাড়ের ভেতর অদ্ভুত শব্দ শুনেছি। গুরুগম্ভীর একটা ধুপ-ধুপ শব্দ। অনেকটা হার্টবিটের মতো।

মনিদা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লেন—'এরকম কোনো শব্দ শুনি নি তো!'

কিশোরদা বললেন, 'এডগার এ্যালান পো'র সেই গল্পটার কথা মনে হচ্ছে। একটা লোক খুন করে একজনের হার্টটাকে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলো। পরে শুনতে পেলো মাটির তলা থেকে হার্টবিটের শব্দ আসছে। গিয়ে দেখে বিটের সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গার মাটিও ওপরে উঠছে আর নামছে।'

বাবু শুকনো গলায় বললো, 'আমরা পাহাড়ের কোথাও মাটি ওঠানামা করতে দেখি নি।'

কাষ্ঠ হেসে কিশোরদা বললেন, 'আমি তোমাদের গল্পের কথা বলেছি। সত্যি সত্যি এর-কম হয় নাকি!'

মনিদা চিন্তিত গলায় বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে ইটাগঞ্জ বাগানে আছি, এমন কথা তো কখনো শুনি নি! তোমরা সত্যি শুনেছো?'

এমন সময় নেলী খালা এলেন কিশোরদা আর মনিদার জন্য চা নিয়ে। বললেন, 'খুব সিরিয়াস আলোচনা মনে হচ্ছে! ডিসটার্ব করলাম না তো?'

কিশোরদা বললেন, 'আবির বাবুরা বলছিলো ওরা কোন এক পাহাড়ের নাকি হার্ট-বিট শুনেছে।'

সকালের কথা নেলী খালাকে বলি নি। তিনি পিটপিট করে তাকালেন আমার আর বাবুর দিকে—'পাহাড়ের হার্টবিট! বড়োদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে তোমাদের বারণ করেছি না! দিন দিন ফাজিল হচ্ছো।' এরপর কিশোরদাকে বললেন, 'ছেলেরা মাঝে মাঝে আজ-গুবি গল্পো বলতে ভালোবাসে। আপনি ওদের সব কথা বিশ্বাস করবেন না।'

কিশোরদা আর মনিদা হা হা করে হাসলেন। 'তাই বলুন! আমরা তো মহা চিন্তায় পড়ে গেছি পাহাড়ের হার্টবিটের কথা শুনে। দারুণ ইমাজিনেশন! যে শুনবে তার হার্টবিট ডবল হয়ে যাবে।' কিশোরদার কথা শুনে মনে হলো এমন হাসির কথা তিনি বুঝি আর শোনেন নি। আমাদের সবার চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেলো। এ নিয়ে আমরা আর কথা বাড়লোম না।

রাতে ঠিক খাওয়ার সময় এলেন জাহেদ মামা। হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে বসার পর নানু বললেন, 'কদিন ধরে তুমি বেশ অনিয়ম করছো জাহেদ। তোমাকে যথেষ্ট ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'একটু ঝামেলার ভেতর আছি আব্বু।' বিচলিত গলায় বললেন জাহেদ মামা।

'খাওয়াটা অন্তত সময়মতো করতে পার তো!'

জাহেদ মামা মাথা নেড়ে সায় জানালেন। তারপর নেলী খালাকে বললেন, 'কাল রাতে প্রফেসর ইরফান হাবিবকে খেতে বলেছি।'

'কে তিনি?'

'সে কি! এদেশের এতো বড়ো এক জন জিওলজিস্ট, কত পাবলিকেশন! নাম শোনো নি?'

মৃদু হেসে নেলী খালা বললেন, 'না, শুনি নি। প্রথম কারণ, জিওলজি আমার সাবজেক্ট নয়; দ্বিতীয় কারণ, দেশে ফিরেছি মাত্র দেড় বছর হলো। তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় কিভাবে?'

'আজ আমার অফিসে এসেছিলেন। ওঁর ধারণা পাথারিয়াতে বড়ো একটা তেলের রিজার্ভ আছে। এখানে আর্মি সিক্যুরিটি আরো কড়া করা দরকার। বললেন, স্যাবোটাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'কারা স্যাবোটাজ করবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন নেলী খালা।

ইতস্তত করে জাহেদ মামা বললেন, 'তিনি সব কথা খুলে বলেন নি। চাপা স্বভাবের মানুষ, কম কথা বলেন।'

আমাদের চারজনের চোখে অনেক প্রশ্ন থাকলেও নানুর জন্য কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে আগের রাতের মতো বারান্দায় এসে বসলাম। উদ্দেশ্য—যদি কোনো আলোর সঙ্কেত দেখা যায়!

বাবু বললো, 'আলোর কথাটা জাহেদ মামাকে জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি কি?'

একটু ভেবে বললাম, 'দেখো, এমনিতে জাহেদ মামা অনেক ঝামেলায় আছেন। এ সময়ে আমরা বাড়তি কোনো ঝামেলায় জড়াই, এটা তিনি পছন্দ করবেন না।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'ব্যাপারটা জানলে জাহেদ মামাদের উপকারও তো হতে পারে। মনে করো ওরা যদি আর্মির লোক না হয়!'

ঠিক এই সময়ে নেলী খালা ভেতর থেকে ডাকলেন, 'আবির একটু কথা শুনে যাও তো।'

নানুর শোবার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরকে নেলী খালা স্টাডি রুম বানিয়েছিলেম। সেখানে বসে তিনি কি যেন লিখছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই নিচু গলায় বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ঢিবঢিব করতে লাগলো। অনেকটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কুলের সেরা ছাত্রের নাম ঘোষণার আগে যেরকম হয়। অনুমান ঠিকই করেছিলাম। নেলী খালা বললেন, 'অপুর চিঠি পেয়েছি।'

'কোত্থেকে লিখেছে?' চাপা উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলাম আমি।'

'ও চিটাগাঙেই আছে। আমাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলো শহরের। আমি এখানে এসে ঠিকানা জানিয়ে ওকে লিখেছিলাম।'

'ভাইয়া কেমন আছে নেলী খালা? কি লিখেছে চিঠিতে?'

নেলী খালা কথা না বলে চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। স্কুলের খাতার রুল-টানা কাগজে ভাইয়া লিখেছে—

নেলী খালা, চিঠিতে তোমার বিয়ের খবর জানতে পেরে দারুণ খুশি হয়েছি। তোমরা আমার অভিনন্দন জেনো। বাবা, মা, আবির, সবাই ভালো আছে জেনেও খুশি হয়েছি। এরকম খুশির খবর কদাচিৎ পাই। জানো তো, সরকারের লোকেরাকিভাবে হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজছে। পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তোমার দু' মাসের টাকা একসঙ্গে পাওয়াতে খুব উপকার হয়েছে। শিগগিরই আমাকে সিলেট যেতে হতে পারে। সময় পেলে দেখা করবো। কিছু পুরনো গরম কাপড় আর ওষুধ জোগাড় করে রেখো। তোমরা চলে আসার পর পাকড়াশী আবার জমিয়ে বসেছে। তবে তোমার বাড়ি ঠিকই আছি। ওকে বলেছি বাড়ির দিকে নজর দিলে ওর কপালে দুঃখ আছে। ওর উড়ো চিঠি নিয়ে ভেবো না। মিছে-মিছি ভয় দেখিয়েছে। তোমরা ভালো থেকো। ইতি—অপু

চিঠি পড়া শেষ করে ভাইয়ার কষ্টের কথা ভেবে বুকটা টনটন করে উঠলো। ঠিকমতো খেতে পায় না, শীতে গরম কাপড় নেই, হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়—দেশের জন্য কাজ করা সত্যি বড়ো কষ্টের। অথচ ভাইয়া মুক্তিযুদ্ধের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-জন সেরা ছাত্র ছিলো। ম্যাট্রিক আর ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম দশ জনের ভেতর নাম ছিলো, ফিজিক্সে আনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে এক নম্বরের জন্য। নেলী খালাকে বললাম,

'তোমাকে আগে বলার সুযোগ পাই নি। গতবার তোমাকে বলেছিলাম না, আমার স্কলার-শিপের বেশ কিছু টাকা জমেছে। ভাইয়াদের জন্য আমি এক হাজার টাকা এনেছি।'

মিষ্টি হেসে আদর করে আমার কপালে চুমু খেলেন নেলী খালা—'তুই সত্যি তাহলে অপুদের জন্য ভাবিস!'

আমার বুকের ভেতর থেকে কান্না উঠে এসে গলার কাছে দলা পাকিয়ে গেলো। ঢোক গিলে বললাম, 'ভাইয়ার কথা আমি সব সময় ভাবি নেলী খালা। তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে তুমি ওদের সাহায্য করো বলে।'

'ঠিক আছে আবির, এবার যাও, ওরা বসে আছে। জানো তো, এসব কথা যে কাউকে বলতে হয় না। ওরা জিজ্ঞেস করলে বলবে সুয়েটারের মাপ নেয়ার জন্য ডেকেছিলাম।'

'জানি নেলী খালা।' বলে আমি বারান্দায় এসে ললিদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

'নেলী খালা ডেকেছিলেন কেন আবির?' জানতে চাইলো বাবু।

'সুয়েটারের মাপ নিতে ডেকেছিলেন।'

কথাটা কেউ অবিশ্বাস করলো না। টুনি বললো, 'আমরা ফিরে যেতে যেতে মা আমা-দেরগুলো বোনা শেষ করে ফেলবেন।

বাবু একটু পরে বললো, 'আমার জন্য কেউ বুনবে না।'

'বা রে, তোমার তো সুটকেস বোঝাই গরম কাপড়! আমি বুঝি দেখি নি?'

টুনির কথার কোনো জবাব দিলো না বাবু। ও যখন খুব ছোট তখন মেজো কাকী মারা গিয়েছেন। মায়ের স্নেহ বলতে যা বোঝায় বাবু কখনো তা পায় নি। ওকে বললাম, 'নেলী খালা শুধু আমার জন্য বুনছেন কে বললো! তোমার আর আমার এক মাপ বলে তোমাকে ডাকেন নি।'

'এটা তুমি বানিয়ে বলছো আবির। নেলী খালা আমার জন্য কেন সুয়েটার বানাবেন?'

কেন বানাবেন সেটা আমি কি করে বলবো?'

'জিজ্ঞেস করবো নেলী খালাকে?' চ্যালেঞ্জের গলায় বললো বাবু।

'জিজ্ঞেস করো।' আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। বাবুকে খুশি করার জন্য কথাটা বলেছিলাম। আসলে নেলী খালা আমাদের কারো জন্যেই সুয়েটার বুনছেন না।

বাবু একছুটে ভেতরে গেলো। আমি রীতিমতো প্রমাদ গুনলাম। নেলী খালা যদি মানা করেন, কি লজ্জার ব্যাপার হবে! একটু পরেই দৌড়ে এলো বাবু। উত্তেজিত গলায় বললো, 'নেলী খালা সত্যি সত্যি আমার জন্য সুয়েটার বুনছেন। কি দারুণ ব্যাপার, তাই না?'

'নেলী খালার মতো মানুষ হয় না।' আস্তে আস্তে বললো ললি।

আমার মনের কথাটি বলার জন্য মনে মনে ললিকে ধন্যবাদ জানালাম। নেলী খালার জন্য গর্বে বুকটা ভরে গেলো।

'আমরা কাল—' টুনি কি যেন বলতে যাবে, হঠাৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে চাপা উত্তেজিত গলায় বাবু বললো, 'ওই দেখ, আজ আবার—।'

তাকিয়ে দেখি, কাল যেখানটায় ছিলো আজও ঠিক সেখান থেকে সার্চ লাইটের আলোর সঙ্কেত পুব দিকের কালো আকাশে দু' বার জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে গেলো।

আমরা চারজন কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলাম না। কে পাঠাচ্ছে এই আলোর সঙ্কেত কার জন্য? ওরা কি ভালো লোক না খারাপ লোক? এমনিতরো অনেক প্রশ্ন আমাদের সবার মনে। উত্তর কারো জানা নেই। কোন সূত্র নেই। জাহেদ মামাকে বলা যেতে পারে। তিনি যদি বলেন ওটা আর্মির কাজ নয়, তাহলে? অন্ধকারে ঠিক বোঝাও

যাচ্ছিলো না ওটা কত দূরে। হতে পারে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কোনো রুটিন সিগনাল পাঠাচ্ছে ওদের কাউকে।

অনেক রাতে আমরা ঘুমোতে গেলাম। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখলাম পাকড়াশী একটা টর্চ জ্বালিয়ে নেলী খালাদের বাংলোটাকে দেখছে আর খি-খি করে হাসতে হাসতে বলছে, মজা টের পাওয়াচ্ছি।

সকালে বড়িবি বললো, 'ছোটে সাব, তুমার খাঁসির দাওয়াই বহুত উমদা আছে। হামার খুব আরাম হয়েছে।'

যে জন্যে ওকে কাশির ওষুধ দেয়া, সে কথাটা জানতে চাইলাম—'তোমাকে একটা খবর নিতে বলেছিলাম, নিয়েছো?'

'কেন নিবে না ছোটে সার! বাসন্তী বললো, এখানকার সব থেকে পুরানা আদমী আছে মনিপুরি দিদিমা। সও সাল উমর আছে। তুমরা কি যাবে তার কাছে?'

আমি বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম, 'দেখি, সময় পেলে না হয় ঘুরে আসবো। কোথায় থাকেন তোমাদের দিদিমা?'

'তিনার একটা আশ্রম আছে বড়লেখা স্কুলের কাছে। ইখান থেকে দো-তিন মিল দূর আছে।'

নাশতা খাওয়ার পর নেলী খালাকে বললাম, 'এখানে একটা স্কুল আছে, তুমি গিয়েছিলে কখনো?'

'এখানে কোথায়?' ভুরু কুঁচকে বললেন নেলী খালা—'সে তো বড়লেখায়। স্কুলে আমি গিয়ে কি করবো!'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কেন, মেজরের বউদের বুঝি স্কুলের ফাংশনে দাওয়াত দেয় না?'

'ফাংশনের জন্য সারকেল অফিসারের বিবি আছেন।' নেলী খালা হেসে ফেললেন—'স্কুলে কি কাজ?'

'কাজ আবার কি! এমনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'দুপুরে জাহেদ এলে ওর সঙ্গে যেতে পারো।'

ঘড়িতে যখন ঠিক একটা বাজলো—জাহেদ মামা খেতে এলেন। খাওয়ার টেবিলে নেলী খালা বললেন, যাওয়ার পথে আবিরদের স্কুলের পথে নামিয়ে দিও।'

জাহেদ মামা খেতে খেতে কি যেন ভাবছিলেন। নেলী খালার কথার জবাবে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানালেন।

আমরা খেয়ে উঠে জাহেদ মামার জীপের পেছনে উঠে বসলাম। আশ্রমে যাবো, তাই স্ক্যাটরাকে রেখে গেলাম। ব্যাপারটা ও মোটেই পছন্দ করলো না। ড্রাইভার ছিলো জীপে। জাহেদ মামা সামনের সিটে বসে গম্ভীর হয়ে ড্রাইভারকে বললেন, 'আগে স্কুলের দিকে যাও।'

নেলী খালা বারান্দা থেকে বললেন, 'তোমরা সন্ধের আগে ফিরবে।'

বড়লেখায় যাওয়ার পথে স্কুল। জীপে আসতে সময় লাগলো মিনিট সাতেকের মতো। আমাদের নামিয়ে দিয়ে জাহেদ মামা বললেন, 'আশা করি তোমারা পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে পারবে!'

'কেন পারবো না?' ব্যস্ত টুনি বললো, 'এইটুকুই তো পথ!'

জাহেদ মামা আর কোনো কথা না বলে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেন। খেয়ালও করলেন না, যে স্কুলের সামনে আমরা নেমেছি সেটাতে কোনো ক্লাস হচ্ছে না। মাঠে শুধু দুটো ছাগল চরছে।

টুনি বললো, 'এ কি, স্কুল যে বন্ধ!'

বাবু বললো, 'তাতে কি, আমরা সত্যি সত্যি স্কুল দেখতে এসেছি নাকি!'

'নেলী খালা যদি জিজ্ঞেস করেন?'

'বলবে স্কুল দেখেছি। সেখান থেকে আশ্রমে গেছি।'

ললি বললো, 'আশ্রমটা কোথায় দেখছি নাতো!'

আমাদের দেখতে পেয়ে স্কুলের ভেতর থেকে ছাগুলে দাড়িওয়ালা মালিগোছের একটা লোক নিড়ানি হাতে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আফনারা কই যাইতায়?'

লোকটার কথা শুনে ললির আড়ালে গিয়ে টুনি হাসি চাপলো। আমি বললাম, 'মনিপুরি দিদিমার আশ্রমে যাবো।'

'আশ্রমে নি যাইতায়? দিদিমা এই সময় কারো লগে মাতে না।'

'আশ্রমটা কোথায়?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো বাবু।

লোকটা আঙুল তুলে দেখালো—'ওই তালগাছের নিচে তারার আশ্রম। আফনারা হিন্দু না মোসলমান?'

'আমরা মানুষ।' এই বলে ছাগুলে দাড়ির অবাক চোখের সামনে দিয়ে আমরা আশ্রমের পথে এগিয়ে গেলাম।

স্কুল থেকে আশ্রম বেশি দুরে নয়। বড়ো একটা আমবাগানের মাঝখানে ঝকঝকে নিকোনো উঠোন, তিন পাশে তিনটা মাটির ঘর, খড়ের চালে কুমড়োলতা বেয়ে উঠেছে। মস্তো বড়ো কয়েকটা চালকুমড়ো চালের ওপর পড়ে আছে। এক পাশে গাদা ফুলের ঝোপ, অল্প দূরে লাউয়ের মাচার পাশে দুটো লঙ্কাজবার গাছ। বেশ ছিমছাম শান্ত পরিবেশ।

এক জন বুড়ো লোক আমাদের দেখে ঘর থেকে বেরুলেন, কপালে চন্দনের তিলক, চোখে রিমের চশমা, মুখে প্রসন্ন হাসি। বললেন, 'এসো বাছারা, বসো এখানে।'

ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতা ছিলো। আমরা সেখানে বসলাম। বুড়ো বললেন, 'আমার নাম হরেকৃষ্ণ গোস্বামী। সবাই ডাকে গোঁসাইদা। তোমাদের পরিচয় কি বাছারা? কোত্থেকে আসা হলো?'

আমরা আমাদের নাম বললাম। জাহেদ মামার পরিচয় দিয়ে বললাম, 'এখানে বেড়াতে এসে মনিপুরি দিদিমার আশ্রমের কথা শুনেছি। ওঁর বয়স নাকি এক শ' বছর? নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন?'

গোঁসাইদা মৃদু হেসে বললেন, 'এক শ' নয়, দিদিমার বয়স এই মাঘে এক শ' তিন হবে। পুরনো দিনের কথা সব মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেবার সিলেট এলেন, দিদিমার ভজন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার আবছা আবছা মনে পড়ে। খুব ছোট ছিলাম তখন।'

'আপনারা এখানে কবে এসেছেন?'

আমার প্রশ্ন শুনে গোঁসাইদা মনে মনে হিসেব করে বললেন, 'তা ধরো চল্লিশ বছরের ওপর হবে।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিস হরেকেষ্ট?' বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বেরুলেন টকটকে ফর্সা এক বুড়ি। এই বুঝি মনিপুরি দিদিমা! দেখে মনে হয় না এতো বয়স।

আমাদের ভুল ভাঙলো গোঁসাইদার কথায়—'এরা দিদিমাকে দেখতে এসেছে রাধা মাসি। ছাউনির বড়ো সায়েবের কুটুম্ব।' আমাদের বললেন, 'ইনি হলেন রাধা মাসি, দিদিমার ছোট মেয়ে।'

রাধা মাসি এক গাল হেসে বললেন, 'এসো তোমরা, ভেতরে এসো।'

আমরা ওঁকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। এক কোণে তক্তপোষের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন মনিপুরি দিদিমা। কিছুটা চীনা ধাঁচের চেহারা, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, গেরুয়া রঙের থান পরনে, গায়ে মোটা খদ্দরের চাদর। রাধা মাসি আমাদের পাশের তক্তপোষে বসিয়ে দিদিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে বললেন, 'মা, এরা তোমাকে দেখতে এসেছে। মস্ত লোকের ছেলেমেয়েরা।'

দিদিমা মাথা নাড়লেন। মৃদু হাসলেন। সারা মুখে বয়সের রেখাগুলো কেঁপে উঠলো—'আজ তোরা কেন বেরিয়েছিস? আজ না অমাবস্যা!'

'অমাবস্যায় বেরুলে কি হয়?' নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম আমি।

রাধা মাসি আগের মতো চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরা জানতে চাইছে অমাবস্যায় বেরুলে কি হয়?'

'অভিশাপ, অভিশাপ!' চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, মনিপুরি দিদিমা— 'অমাবস্যার রাতে পাহাড় থেমে নেমে আসে অতৃপ্ত আত্মারা। আজ একটা অঘটন ঘটবে।'

'কাদের আত্মা?' আবার প্রশ্ন করলাম আমি। রাধা মাসি আগের মতো কথাটা দিদিমাকে শোনালেন।

'বাগানের কুলিদের আত্মা, মাটি-কাটা মজুরদের আত্মা। আহ্, ওরা কেউ বাঁচে নি। ওদের আত্মা এখনো গুমরে কাঁদে। আমি সব শুনতে পাই। সব শুনি, সব দেখি।' এই বলে দিদিমা চোখ বুজলেন।

রাধা মাসি ভয়পাওয়া শুকনো গলায় বললেন, 'তোমরা এখন যাও। বহু দিন পর মার ঘোর লেগেছে। আবার এসো তোমরা।'

আমরা ঘর থেকে বেরুতেই রাধা মাসি গোঁসাইদাকে ডাকলেন—'হরেকেষ্ট শিগগির যাও, সবাইকে খবর দাও, আজ সারারাত নামগান হবে। মা'র ঘোর লেগেছে। আজ রাতে ভীষণ অঘটন ঘটতে পারে।'

মনিপুরি দিদিমার আশ্রম থেকে যখন বেরুলাম, তখম মাত্র তিনটা বাজে। বিপদের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখলাম না। শীতকাল বলে বিকেল বিকেল মনে হচ্ছিলো। এদিকে শীতও পড়েছে বেশ। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কনকনে উত্তুরে বাতাস বইতে থাকে। বিকেলের রোদ পিঠে নিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিলো আমাদের।

টুনি বললো, 'স্ক্যাটরা নিশ্চয়ই মনে মনে আমাদের গাল দিচ্ছে।'

'মনে মনে কেন?' বাবু বললো, 'জোরে জোরে দিলেও কি বুঝবে কিছু?'

'খুব বুঝবো!'

'কি জানি বাবা!' বাবু কাঁধ নাচালো—'যার ভাষা সে বুঝবে!'

টুনি প্রথমে কিছু বোঝে নি। আমাকে আর ললিকে দেখে বললো, 'তোমরা হাসছো কেন ললিপা!'

'বাবু তোমাকে কি বলেছে টুনি?' হাসতে হাসতে বললো ললি।

'কেন, কি বলেছে?' টুনি বাবুর দিকে তাকালো। বাবু তখন হাসি চাপতে ব্যস্ত। হাঁটছিলো একটু দূরে দূরে।

'তোমাকে কুকুর বলেছে।'

'বা রে, কখন বললো?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে টুনির মনে পড়লো বাবু আসলে কি বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে—'কি অসভ্য!' বলে বাবুর পিঠে কিল মারার জন্য ছুটলো। বাবু ততোক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে।

ললি হাসতে হাসতে বললো, 'বাবু, টুনি, দুটোই ছেলেমানুষ।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি কি ললি'—ঠিক তখনই নজরে পড়লো দূরে হঠাৎ জঙ্গল ফুঁড়ে বেরুলেন কিশোরদা আর—তাঁর বন্ধু মনিদা। ললিও আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো ওদের। বাবু টুনি উল্টোদিকে দৌড়াচ্ছিলো বলে কিছু দেখতে পেলো না।

ললি বললো, 'কিশোরদা আর মনিদাও বেড়াতে বেরিয়েছেন। যাবে ওদিকে?'

'একটু দাঁড়াও।' ললিকে আমি একটা গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে এলাম। কিশোরদা আর মনিদার চলাফেরার মধ্যে একটা সতর্ক সন্ত্রস্ত ভাব। 'ভালো করে লক্ষ করো ললি। ওরা লুকিয়ে কিছু করেছেন কিম্বা করতে চাইছেন।'

ললি বললো, 'আমার মনে হচ্ছে ওঁরা ভয় পেয়েছেন। কাল আমাদের কথা শুনে ওঁরা নির্ঘাত পাহাড়ের হার্টবিট শুনতে গিয়েছিলেন।'

বাবু টুনি ছুটতে ছুটতে আবার আমাদের কাছে এলো। মনে হলো ওদের কিল মারার পর্ব আপাতত শেষ হয়েছে। কিশোরদা আর মনিদার ভয়-পাওয়া চলাফেরা ওদেরও দেখালাম।

বাবু উত্তেজিত হয়ে বললো, 'চলো, ওদের ফলো করি।'

টুনির গলা শুকিয়ে গেলো—'ললিপা, আমার ভয় করছে। শোনো নি মনিপুরি দিদিমা কি সবা আত্মা আর অভিশাপের কথা বলেছেন? আজ নাকি কি সব ঘটবে!'

টুনির কথা শেষ না হতেই কিশোরদারা আবার জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেলেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম জঙ্গল থেকে তাঁরা কখন বের হন দেখবার জন্য। সাড়ে চারটা বেজে গেলো—ওঁরা এলেন না। টুনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো, 'নেলী খালা বলেছেন, সন্ধের আগে ফিরতে। তোমরা আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, চলো। কিশোরদাদের সঙ্গে দেখা হলে জানতে দেবো না ওদের যে আমরা দেখেছি। নিজে থেকে কি বলেন দেখা যাক।'

নেলী খালা আমাদের জন্য চা নিয়ে লনে অপেক্ষা করছিলেন। স্ক্যাটরা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। নেলী খালী বললেন, 'ওর ভারি মন খারাপ, তোমরা ওকে সঙ্গে নাও নি।'

বললাম, 'স্কুল থেকে আমরা মনিপুরি দিদিমার আশ্রমে গিয়েছিলাম।'

'বড়িবি যার কথা বলে, সেই বুড়ি? সত্যি সত্যি ওর বয়স এক শ' না সব বানানো গপ্পো?' জানতে চাইলেন নেলী খালা।

গোঁসাইদার মতো করে বললাম, 'এক শ' নয়, দিদিমার বয়স এই মাঘে এক শ' তিন হবে। ওঁর মেয়ের বয়সও আশির কাছে!'

বাবু জিজ্ঞেস করলো, 'আজ কিশোরদারা আসেন নি?'

'না।' মুখ টিপে হাসলেন নেলী খালা—'কিশোর পারেখ দেখি ছবি করার কথা বলে সবাইকে ওর ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।'

টুনি বললো, 'মনিপুরি দিদিমা কি সব আত্মা আর অভিশাপের কথা বলেছে। আজ নাকি কি ঘটবে!'

'ওসব ওদের ভড়ং। শান্ত গলায় বললেন নেলী খালা—'উদ্‌ভুট কথা না বললে লোকে ওদের অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্বাস করবে কেন?'

ইরফান হাবিবের ম্যাপ চুরি

বিকেলে চা খেয়ে আমরা আর কোথাও যাই নি। রাতে মেহমান আসবেন—নেলী খালার ড্রইংরুম গোছালাম সবাই মিলে। বইগুলো সব তিনটা বড়ো কাঠের বাক্‌সে বোঝাই ছিলো। সেগুলো বের করে ঝেড়ে-মুছে দেয়ালজোড়া বুক শেলফে সাজিয়ে রাখলাম। সোফার কুশনগুলোর কাপড় বদলালাম। ফুল এনে দুটো ফুলদানি সাজালাম। সব দেখে নানু পর্যন্ত বললেন, 'চমৎকার হয়েছে।'

সাজানোর ব্যাপারে বাবুর কৃতিত্বটাই বেশি। হবে না কেন, ওর মতো আমরা কেউ তো ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের ক্লাশ করি নি। যদিও ও খুঁত খুঁত করছিলো মাপ মতো একটা পেইন্টিং-এর জন্য। নেলী খালা বললেন, 'কিসসু ভেবো না বাবু। আর্ট কলেজে হাশেম খান আছেন, তোমাদের জাহেদ মামার সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন। গতবার আমাদের নুলিয়াছ-ড়িতে বেড়াতে গিয়ে বলেছেন, বিয়েতে ওঁর একটা অয়েল পেইন্টিং উপহার দেবেন। জাহেদ ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলবে।'

রাতে প্রফেসর ইরফান হাবিবকে নিয়ে জাহেদ মামা অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই এলেন। সবার সঙ্গে প্রফেসরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা তখন ড্রইংরুমে বসেছি-লাম। প্রফেসরকে দেখে মনে হয় বয়স প্রায় ষাটের কাছে। ছোট খাট গড়ন, গোল গাল মুখ ভরা দাড়ি, পুরু লেন্সের চশমা চোখে। মাথা জোড়া টাক, ঘরে ঢোকার আগে অবশ্য ওটার ওপরে একটা ক্যাপ ছিলো। ক্যাপটা খুলতেই লাইটের আলো পড়ে গোল মাথাটা চকচক করে উঠলো। কথা বলতে বলতে আনমনে মাথার অদৃশ্য চুলগুলো হাত দিয়ে পরি-পাটি করে দিচ্ছিলেন। বলাই বাহুল্য হাসি চাপতে আমাদের চারজনের খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

আমাদের নুলিয়াছড়ির কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন জাহেদ মামার কাছে। সেজন্যে কিনা জানি না, আমাদের ওপর ওঁদের সার্ভে টীমের একটা কাজ চাপিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই পাথারিয়া বেড়াতে এসে সারাদিন ঘরে বসে কাটাও না?'

'কি যে বলেন স্যার!' জবাব দিলেন জাহেদ মামা—'খাওয়ার সময় ছাড়া ওদের দেখা পাওয়া ভার।'

'ওভাবে বললে কথাটা তোমার জন্যেও প্রযোজ্য। নাকি বৌমা?' মুখ টিপে হেসে প্রফেসর তাকালেন নেলী খালার দিকে।

নেলী খালা শুধু লাজুক হাসলেন।

'শোন ছেলেমেয়েরা, বাইরে যখন ঘুরতে যাও তখন এই বুড়োর জন্য একটা জিনিস কোথাও চোখে পড়ে কিনা দেখবে।' এই বলে প্রফেসর রহস্য ভরা চোখে তাকালেন আমার দিকে।

'কি জিনিস স্যার?' জাহেদ মামার দেখাদেখি আমরাও প্রফেসরকে স্যার ডাকা শুরু করেছি।

'পাথর।' প্রফেসর মৃদু হেসে বললেন, 'কোনো অচেনা অদ্ভুত গড়নের বা রঙের পাথর পেলে তুলে নিও। শুধু খেয়াল রেখো পাথরটা কোথায় পেলে।'

'পাথর দিয়ে কি হবে স্যার?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো বাবু।

'জানো না বুঝি, আমরা যে তেল খুঁজতে এসেছি। আমাদের অনুসন্ধানের কাজে লাগবে।' এই বলে কি যেন ভাবলেন। তারপর জাহেদ মামাকে বললেন, 'এ জায়গাটাতে অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাংলাদেশের অন্য যে সব জায়গায় গ্যাস পাওয়া গেছে বা তেল পাওয়া যাবে বলে ভাবছি, সে সব জায়গায় দেখা যায় না।

টুনি বললো, 'মনিপুরি দিদিমা বলেছেন ও জায়গাটার ওপর নাকি অভিশাপ আছে। কি সব অতৃপ্ত আত্মারা অমাবস্যার রাতে ঘুরে বেড়ায়।'

নেলী খালা মৃদু গলায় বললেন, 'আবার আজেবাজে কথা বলছো টুনি?'

'মনিপুরি দিদিমা কে?' প্রফেসর আমাকে প্রশ্ন করলেন।

'এই এলাকার সবচেয়ে পুরনো মানুষ। একশ'র ওপর বয়স।'

'এসব আজেবাজে কথা বলে বুড়িটা আশ্রম খুলে ভালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।' নেলী খালার গলায় বিরক্তির ছোঁয়া।

'সব কিছু আজেবাজে বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না বৌমা।' প্রফেসর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'সার্ভে করতে গিয়ে আমি পৃথিবীর হেন দেশ নেই যে যাই নি। সব জায়গায় দেখেছি, বইয়ের চেয়ে অনেক সময় দরকারি তথ্য পাওয়া যায় স্থানীয় লোকজনের কাছে।'

'অতৃপ্ত আত্মা আর অভিশাপ নিশ্চয়ই কোনো দরকারি তথ্য হতে পারে না।'

'পারে বৌমা, পারে।' কথাটা প্রফেসর এমনভাবে বললেন, যেন কোনো বাচ্চাকে বোঝাচ্ছেন—'আবিরদের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে এখানে থার্টিজে যে অয়েল এক্সপিডিশন হয়েছিলো মনিপুরি বুড়ি সেটা জানে। তুমি কি ও বিষয়ে কিছু শুনেছো বৌমা? জানো এখানে কি ঘটেছিলো?'

'না তো!' অবাক হয়ে বললেন নেলী খালা।

'তাহলে?' মুখ টিপে হেসে প্রফেসর বললেন, 'দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে শেল অয়েল এখানে তেল আবিষ্কার করেছিলো। রিগ বসাতে গিয়ে তেলের প্রচণ্ড চাপে ওটা ভেঙে যায়। মুহূর্তের ভেতর পাহাড় থেকে বন্যার মতো তেলের স্রোত নেমে এসে কাছাকাছি একটা চা

বাগানে ঢুকে সব সয়লাব করে দিয়েছিলো। অনেক লোক মারা গিয়েছিলো। বুড়ি হয়তো তাদের অভিশাপের কথা বলেছে।'

'আপনি বুড়ির আত্মার গল্প বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবো কিনা এ নিয়ে ভাববার সময় কখনো পাই নি। তবে আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি।'

নানু এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর বললেন, 'প্রফেসর হাবিবের যদি ফেরার তাড়া না থাকে কিছুক্ষণ বসে কফি খেতে খেতে আপনার কিছু অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে পারি।'

'বিলক্ষণ!' হেসে বললেন প্রফেসর 'আপনার জামাই যদি আমাকে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাহলে মাঝরাত অব্দি আড্ডা মারতে আমার আপত্তি নেই। তবে কফিটা জরুরি।'

মৃদু হেসে নেলী খালা কফি আনতে গেলেন। আমরা সবাই ড্রইং রুমে গিয়ে বসলাম। প্রফেসর নানুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি শুনতে চান বলুন।'

নানু বললেন, 'সেই যে বলছিলেন', 'বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি।'

একটু ভেবে প্রফেসর বললেন, 'আমি লক্ষ করেছি খনি এলাকার মানুষের ভয় আর কুসংস্কারের পরিমাণটা একটু বেশি। সেকেণ্ড ওয়াল্ড ওয়ারের ঠিক আগের কথা বলছি। আমি তখন ধানবাদের এক কয়লা খনিতে কাজ করি। তখনও কলেজে জয়েন করি নি। নতুন একটা জায়গা সার্ভে করে মনে হলো গ্যাস পাওয়া যাবে। সে সময় সার্ভের যন্ত্রপাতি এখনকার মতো সফিসটিকেটেড ছিলো না। জোরে সোরে কাজ করছি। যন্ত্রের অভাব মস্তিষ্ক আর শ্রম দিয়ে পূরণ করছি। আমাদের একটা এলাকা ছিলো ক্যাম্প থেকে মাইল খানেক দূরে। একদিন শুনি কুলিরা কাজ করবে না। খোঁজ নিয়ে দেখি এইসব অতৃপ্ত আত্মার ব্যাপার। ওরা বললো, রাতে পাহাড়ের ভেতর কারা নাকি কাঁদে। তখন ছিলো শীতকাল। আমার দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে পাহাড়ের কাছে তাঁবু গাড়লাম। রাতে খেয়ে দেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে তাঁবুর পাশে আগুন জ্বেলে বসে গল্প করছি। কান খাড়া করে রেখেছি যদি কিছু শোনা যায়। কোথাও কোনো শব্দ নেই। অবাক হয়ে গেলাম, কোথাও ঝিঁঝি পোকার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিলো না। আমার এক বন্ধু বললো, কুলিরা এত দূরে এসে কাজ করবে না, তাই কি সব বানিয়ে বলেছে আর তুমিও বিশ্বাস করে চলে এলে। ঠিক তখনই শুনলাম সেই শব্দ। মনে হলো বহু দূর থেকে আসছে চাপা একটা গোঙানির শব্দ। একটানা নয়, থেমে থেমে।'

আমরা সবাই গোগ্রাসে গিলছিলাম প্রফেসরের ভূত দেখার গল্প। এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখি টুনি ভয়ে গোল হয়ে ললির গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে! মুখটা ঝুলে গেছে, বাবু ছিলো পাশে, ওর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। ভয় ছিলো বাবু আর ললির চোখেও। তবে নেলী খালা, জাহেদ মামা আর নানুর চোখে ছিলো কৌতূহল।

প্রফেসর বললেন, 'প্রথম দিকে মনে হচ্ছিলো গলা টিপে ধরলে যেরকম শব্দ বেরোয় সেরকম। একজন দুজন নয়, যেন কয়েকশ মানুষকে একসঙ্গে কোনো দানবীয় শক্তি গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে। একটানা নয়, মাঝে মাঝে শব্দটা থেমে যাচ্ছিলো। তারপর শুরু হলো চাপা কান্নার শব্দ। এবার একটানা—হু হু করে কাঁদছিলো কয়েকশ মানুষ। আমারা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। কখন যে আগুন নিভে গেছে টেরও পাই নি। অনেকক্ষণ শোনা গেলো সেই কান্নার শব্দ। তারপর এক সময় কান্নার শব্দ থেমে গেলো। ভোর হলো। পুরোনো তাঁবুতে ফিরে গেলাম। দু'দিন ধরে দলবল নিয়ে পাহাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। অস্বাভাবিক তেমন কিছু চোখে পড়লো না। বাইরে থেকে যা চোখে পড়ে—

চারপাশে ঘন ঝোপঝাড়, জঙ্গল; পাহাড়ে কোনো গাছপালা নেই। মাটিও তেমন পাথুরে নয় যে গাছপালা গজাবে না। কিন্তু সেই পাহাড়টার এখানে সেখানে বুনো ঘাসের শুকিয়ে যাওয়ার চিহ্ন ছাড়া আর কিছু ছিলো না। পরে শুনেছি ওখানে অনেক আগে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাহাড়ের ধ্বস নেমে কয়েকশ মানুষের জ্যান্ত কবর হয়েছিলো।'

আমাদের আরো শোনার ইচ্ছে ছিলো প্রফেসরের এইসব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প। নানু বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে। জাহেদ, প্রফেসর হাবিবকে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

প্রফেসর উঠে মাথায় ক্যাপ পরলেন, হাতব্যাগ থেকে মাফলার বের করে গলায় জড়ালেন। আমাদের বললেন, 'জাহেদকে বলে কাজের এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ লিখে দিয়েছি। তবে তোমাদের জন্য সেটা প্রযোজ্য নয়। আশা করি আমার কাজের কথাটা মনে রাখবে।'

প্রফেসরকে নিয়ে জাহেদ মামা বেরিয়ে গেলেন। নানুও উঠে গেলেন ওঁর ঘরে। নেলী খালা বললেন, 'তোমরা যে পাহাড়ে কিসের শব্দ শুনেছো বলছিলে সেটা কি সত্যি ললি?'

ললি যে মিথ্যে কথা বলে না ওর উপর নেলী খালার এতটুকু বিশ্বাস ছিলো। ললি আস্তে আস্তে বললো, 'সত্যি শুনেছি নেলী খালা।'

'শব্দটা কি হার্টবিটের মতো?'

'হ্যাঁ নেলী খালা। ভারি একটা গমগমে শব্দ।'

'বুঝতে পারো নি কিসের শব্দ?'

'আমার একবার মনে হয়েছিলো সার্ভে টীমের কোনো মেশিনের শব্দ। জাহেদ মামা বললেন, ওরা নাকি নিজেদের এলাকার বাইরে কোথাও যায় নি।' মনিপুরি দিদিমার আশ্রমে যাওয়ার পথে কথাটা সেদিনই বলেছিলেন জাহেদ মামা।

ললির কথা শুনে বেশ চিন্তিত মনে হলো নেলী খালাকে। শুকনো গলায় বললেন, 'তোমারা শুতে যাও।'

পরদিন সকালে জাহেদ মামা নাশতা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন—একটু পরেই পুরোনো একটা জীপ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে প্রফেসর ইরফান হাবিব এলেন। 'কোথায়, মেজর কোথায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।' এই বলে ধপ করে তিনি ড্রইংরুমের সোফায় বসে পড়লেন।

নেলী খালা ব্যস্ত গলায় বললেন, 'ও তো বড়লেখার দিকে গেছে। কি হয়েছে স্যার?'

'নেলী, আমার সর্বনাশ হয়েছে।' ভাঙা গলায় প্রফেসর বললেন, 'যে সার্ভে ম্যাপটার বেসিসে কাজ করছিলাম, এক বছর ধরে যেটা তৈরি করেছিলাম সেই ম্যাপটা কাল রাতে কেউ চুরি করেছে।'

'সে কি! ম্যাপ চুপি করবে কে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন নেলী খালা—'ভুলে কোথাও রাখেন নি তো।'

'না বৌমা। সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। আমার মনে হয় যখন তোমাদের এখানে ছিলাম তখনই কেউ এটা করেছে। আমার কত দিনের পরিশ্রম সব বরবাদ হয়ে গেলো।' হাহাকার করে উঠলেন প্রফেসর।

'আপানার দলের কেউ সরায় নি তো?'

'কি সব বোকার মতো কথা বলো মেয়ে!' কর্কশ গলায় ধমকে উঠলেন প্রফেসর—'দলের কেউ ওটা সরাতে যাবে কেন! আর ওদের সরাবার দরকারই-বা কি! ইচ্ছে করলে ওরা ট্রেস করে নিতে পারতো, চুরি করবে কেন?'

'আমি বুঝতে পারি নি স্যার।' নেলী খালাকে একটু বিব্রত মনে হলো—' কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ভেবেছিলাম জাহেদের সঙ্গে পরামর্শ করবো।'

নানু বললেন, 'আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখুন প্রফেসর হাবিব। জাহেদের অফিসে খবর পাঠাচ্ছি। ও ফিরে এসেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'ঠিক আছে।' বলে উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। ওঁর জন্য খুব খারাপ লাগলো। কাল ওঁকে দেখেই মনে হয়েছিলো সারা জীবন পড়াশোনা করেছেন, আর মাটির নিচে কোথায় মূল্যবান কি লুকিয়ে আছে, খুঁজে বেড়িয়েছেন। এরকম কিছু মানুষ আছে বলে বিজ্ঞান আর সভ্যতা এতোটা এগুতে পেরেছে।

প্রফেসর চলে যাওয়ার পর আমরা চারজন লনে এসে বসলাম। বাবু বললো, 'কাল মনিপুরি দিদিমা যখন বলেছিলেন অঘটন ঘটবে, তখন কথাটাকে পাত্তা দিই নি। অথচ সত্যিই একটা অঘটন ঘটে গেলো।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'ম্যাপটা যে-কোনো রাতে চুরি যেতে পারতো।'

টুনি বললো, 'প্রফেসরের ম্যাপ যদি অতৃপ্ত আত্মারা চুরি করে?'

ললি ওকে চাপা গালায় ধমক দিলো—'বোকার মতো কথা বলো না টুনি। আত্মা কেন ম্যাপ চুরি করতে যাবে?'

বাবু বললো, 'টুনি যদি বোকার মতো কথা বলে, তাহলে বলতে হবে কাল রাতে প্রফেসরও বোকার মতো কথা বলেছেন।'

টুনির জন্য বাবুর টান দেখে মৃদু হাসলাম—'টুনির কথায় আবার প্রফেসরকে টানছো কেন?'

যেন ডিবেটের ক্লাসে বলছে—এভাবে শুরু করলো বাবু, 'আত্মা বলে কিছু নেই এ কথা যদি ধরে নাও তাহলে এ বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই। তবে এও বলি, সায়েন্সের প্রফেসর ইরফান হাবিব কিন্তু আত্মার কথা উড়িয়ে দেন নি। কাল তিনি আর মনিপুরি দিদিমা যা বলেছেন, কথাগুলো নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। পাথারিয়া থেকে তেল তুলতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিলো, বহু লোক মারা গিয়েছিলো। যারা মারা গিয়েছিলো তাদের আত্মা যদি না চায় এখানে আবার তেলের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি হোক, তাহলে প্রফেসরের ম্যাপ চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হবে কেন?'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'তুমি তাহলে আত্মা আছে বিশ্বাস করো?'

'আগে এ নিয়ে ভাবি নি।' বাবু বললো, 'কাল প্রফেসরের কথা শুনে মনে হয়েছে, আমি যা জানি না কিম্বা দেখি নি তার অর্থ এই নয় যে, সেসব পৃথিবীতে নেই।'

বাবুর কথা বলার ধরন দেখে মনে হলো একজন বয়স্ক মানুষ বুঝি কথা বলছে। প্রফেসরের প্রভাব ওর ওপর ভালোভাবেই পড়েছে।

স্ক্যাটরা বসে ছিলো আমাদের পাশে। হঠাৎ ও ছুটে গেলো গেটের দিকে। তাকিয়ে দেখি কিশোরদা আসছেন।

'তোমরা বুঝি আজ কোথাও ঘুরতে বের হও নি?' সামনের খালি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলেন কিশোরদা।

'ভীষণ একটা কাণ্ড হয়েছে কিশোরদা।' টুনি চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'প্রফেসরের ম্যাপ চুরি হয়েছে।'

'কোন প্রফেসর? কিসের ম্যাপ?' টুনির কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন কিশোরদা।

'আপনি কিছুই জানেন না!' অসহিষ্ণু গলায় টুনি বললো, 'সার্ভে টীমের প্রফেসর তেলের খনি খুঁজতে এসেছেন এখানে। কাল রাতে আমাদের এখানে এসেছিলেন। একটু আগে এসে বলে গেলেন, ওঁর একটা ভীষণ দরকারি ম্যাপ কাল রাতে চুরি হয়েছে।'

পুরো ঘটনাটা আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগলো কিশোরদার। বললেন, 'একটু পানি খাবো।'

টুনি ছুটে গিয়ে পানি আনলো। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা খালি করে টেবিলে রেখে কিশোরদা বললেন, 'কে চুরি করেছে প্রফেসরের ম্যাপ?'

বাবু বললো, 'এতোক্ষণ এ নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম। আমাদের ধারণা এর সঙ্গে পাথারিয়ার অভিশাপের একটা সম্পর্ক আছে।' বাবু ওর ধারণার সবটুকু খুলে বললো কিশোরদাকে।

বাবুর কথা শুনতে শুনতে কিশোরদার চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেলো। সব শুনে বললেন, 'আমরাও মনে হচ্ছে ও জায়গায় এমন কিছু আছে যা চোখে দেখা যায় না। সেদিন তোমরা পাহাড়ের হার্টবিট শোনার কথা বলেছিলে। আমি হেসেছিলাম। কাল নিজের কানে শুনে এসেছি। অদ্ভুত একটা ফিলিং হয়েছে পাহাড়টার কাছে গিয়ে। ভীষণ সাফোকেটিং, একটা আনক্যানি ফিলিং—ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না। মনে হয়েছে জায়গাটা ঠিক পৃথিবীর বাইরের কোনো জায়গা, যেখানে মানুষের যাওয়া নিষেধ।'

আমি বললাম, 'আপনি তাহলে বলতে চাইছেন পাথারিয়ার অতৃ আত্মারা সার্ভে ম্যাপ চুরি করেছে?'

'কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাই না। বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত যে, কেউ হয়তো চাইছে না এখানে তেলের জন্য খোঁড়াখুড়ি হোক।'

'কে চাইছে না?' জানতে চাইলো ললি।

'হতে পারে কোনো মানুষ কিম্বা মানুষ নাও হতে পারে। কাল পাহাড়ে গিয়ে মনে হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কত কি রয়ে গেছে—মনে অবিশ্বাস নিয়ে কিছু জানা যায় না।'

টুনি বললো, 'তাহলে কি আপনি ছবি করবেন না?'

কেন করবো না? 'এতোক্ষণে কিশোরদার মুখে হাসি ফুটলো—'সে কথা বলতেই তো এলাম। আমি আজ দুপুরে ঢাকা যাচ্ছি। কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে। এ্যাসিসটেন্ট আর ক্যারেক্টার রোলের জন্য আর্টিস্ট লাগবে কিছু।'

'ফিরবেন করে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কাল দিনটা থাকবো। পরশু বিকেলে ফিরে আসবো। তুমি গল্পের লাইন-আপটা কি হবে ভেবে রেখো। ফিরে এসেই স্ক্রিপ্টটা শেষ করে ফেলবো।'

কিশোরদা বেশিক্ষণ বসলেন না। যাওয়ার সময় জানতে চাইলেন ঢাকা থেকে আমাদরে জন্য কিছু আনতে হবে কিনা। আমি শুধু বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বললাম, 'মাকে বললেন, আমরা ভালো আছি।'

কিশোরদা চলে যাওয়ার একটু পরে নানু এসে বললেন, 'তোমরা কি জাহেদের অফিসে খবর দিতে পারবে, ও যেন ফেরামাত্র প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে?'

'একশ বার পারবো।' বলে আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম। স্ক্যাটরাকে ধমক দিয়েও ফেরানো গেলো না। আর্মি ক্যাম্পে কে কি ভাববে—সে জন্য ওকে নেয়ার ইচ্ছে ছিলো না।

জাহেদ মামাকে ওঁর অফিসেই পাওয়া গেলো। আমাদের দেখে একটু অবাক হলেন। প্রফেসরের ম্যাপ চুরি যাওয়ার কথা শুনে—'মাই গড! আমি ঠিক এ ভয়টাই করছিলাম।'

বলেই যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। একজন জুনিয়র অফিসারকে ডেকে বললেন, 'আমি প্রফেসর হাবিবের ওখানে যাচ্ছি। স্টেশনে কারা যাওয়া আসা করছে কড়া নজর রাখুন।'

কয়েকটা ফাইল আলমারিতে বন্ধ করে জাহেদ মামা আমাদের বললেন, 'তোমরা খেয়াল রেখো, সন্দেহজনক কোনো লোকজন চোখে পড়ে কিনা।'

আমি বললাম, 'আমরা আপনার সঙ্গে আসবো জাহেদ মামা?'

'এসো,' বলে বেরিয়ে পড়লেন জাহেদ মামা। আমরা হুড়মুড় করে জীপের পেছনে উঠলাম।

আর্মি ক্যাম্প থেকে সার্ভে টিমের জায়গাটা বেশ কিছুটা দূরে। উঁচু-নিচু মাটির রাস্তা। যেতে প্রায় মিনিট পনেরোর মতো লাগলো।

তিন দিকে পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা সমতল জমির ওপর গোটা দশেক তাঁবু। দূর থেকেই প্রফেসরকে দেখলাম খোলা জায়গায় একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন দেখছেন। অল্প দূরে কয়েকজন মাপজোখের কাজে ব্যস্ত।

জাহেদ মামার জীপ দেখে ছুটে এলেন প্রফেসর। 'আমার কি হবে মেজর! এতোদিনের পরিশ্রম, সব বরবাদ হয়ে গেলো!' গলা শুনে মনে হলো একেবারে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

'আপনি বিচলিত হবেন না স্যার।' সান্ত্বনার গলায় জাহেদ মামা বললেন, 'আমার যতটুকু শক্তি আছে সব আপনার জন্য। এখান থেকে ম্যাপ চুরি করে কেউ পালাতে পারবে না।'

'তুমি আমার একমাত্র ভরসা। এই ম্যাপ যদি কোনোভাবে ইণ্ডিয়ার হাতে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ইণ্ডিয়া কি করবে আপনার ম্যাপ নিয়ে?'

'কিছুই জানো না দেখছি?' অসহিষ্ণু গলায় প্রফেসর বললেন, 'পাথারিয়া বেসিনটা—আমার অনুমান এর অর্ধেক পড়েছে ইণ্ডিয়াতে। বর্ডারের ওদিকে জায়গাটা খুবই দুর্গম, কখনো কোনো সার্ভে হয় নি। কাজ হয়েছে এখানে। ইণ্ডিয়া যদি জানতে পারে এখানে তেল আছে, তাহলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে হিট করবে। জানোই তো ইণ্টারন্যাশনাল ল অনুযায়ী—একবার ওরা যদি হিট করতে পারে, তাহলে আমাদের এলাকার তেলও ওরা নিয়ে যাবে। কমন বেসিনে যে আগে হিট করে তেল তারই হবে।' শেষের দিকে প্রফেসরের গলাটা করুণ শোনালো।

'কি সর্বনাশ!' আপন মনে বললেন জাহেদ মামা, 'আমি ভাবতেই পারি নি ব্যাপারটা এতো সিরিয়াস। আগে জানলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতাম।'

'যা করার করো।' অসহায়ভাবে প্রফেসর বললেন, 'এ নিয়ে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

আমরা কেউ জীপ থেকে নামি নি। জাহেদ মামা জীপে উঠে প্রফেসরকে বললেন, স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা করার আমরা সব কিছু করবো।'

ফেরার পথে জাহেদ মামাকে রাতে দেখা আলোর সংকেতের কথা বললাম। জাহেদ মামা বললেন, 'আগে বলো নি কেন? চেক করে দেখতাম।'

টুনি অভিমান করে বললো, 'আমরা কিছু বললেই যে নেলী খালা বলেন বানিয়ে গপ্পো বলছি, কাল তো কিশোরাদাও গিয়ে দেখে এসেছেন পাহাড়ের ভেতর যে শব্দ হয়।'

'কিসের শব্দ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন জাহেদ মামা।

ওঁকে পাহাড়ের শব্দের কথাও বললাম। 'স্ট্রেঞ্জ!' বলে জাহেদ মামা গুম হয়ে গেলেন।

আবার আলোর সংকেত

ম্যাপ চুরির আসল বিপদের কথা জানার পর আমরা সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমরা থাকতে প্রফেসর ইরফান হাবিবের মতো একজন বৈজ্ঞানিকের এত বড়ো সর্বনাশ হয়ে যাবে, ভাবতেই পারছিলাম না। সর্বনাশ তো তাঁর একার নয়, সারা দেশের। কে জানে কত শত হাজার কোটি টাকার তেল আছে পাথারিয়ার মাটির নিচে। সকাল থেকে বাবু টুনির খুনসুটি বন্ধ হয়ে গেছে; ললিকে নিয়ে আমরা একা ঘুরে বেড়ানোর উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। দুপুরের পর সবাই লনে বসে ভাবছিলাম, কি করা যায়।

'কথাটা যদিও আমিই প্রথম ভেবেছিলাম,' বললো ললি—'একবার লাল পাহাড়ের ওখান থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়?'

টুনি আঁতকে উঠলো—'ওখানে গিয়ে কি করবে ললিপা?'

'মনে হচ্ছে রহস্যজনক কিছু আছে ওখানে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' ললিকে সমর্থন করলাম আমি। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি। এখন মাত্র দুটো বাজে!'

টুনির মোটেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না, তবু কিছু বললো না। জানে, আমি যখন বলেছি তখন যাবোই। নেলী খালাকে 'ঘুরতে যাচ্ছি' বলে আমরা স্ক্যাটরাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বড়লেখার পরে এদিকে তেমন কোনো লোকালয় নেই। ছড়ানো-ছিটানো গোটা দুই গ্রাম, মনিদাদের চা বাগান, জাহেদ মামাদের ক্যাম্প আর হালে প্রফেসরের সার্ভে টীম — এই মাত্র জনবসতি। গোটা এলাকাটা ছোট বড়ো পাহাড়ে ভরা। লাল পাহাড়ে যাওয়ার পথে একটা লোকও চোখে পড়লো না।

জঙ্গলের ভেতর ধুপ-ধুপ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আমরা যতোই লাল পাহাড়ের কাছে যাচ্ছিলাম, অশুভ সেই শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগালো। স্ক্যাটরাকে আগের মতোই যথেষ্ট ভীত মনে হলো।

আমরা চারজন গভীর নালাটার কিনারে দাঁড়ালাম। হঠাৎ স্ক্যাটরা গরগর করে উঠলো। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। একটানা ধুপ-ধুপ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। নালার ভেজা ভেজা মাটি পোড়া মাংশের মতো দগ দগ করছে। স্ক্যাটরা আবার গর-গর করে আমাদের মুখের দিকে তাকালো। বুঝলাম ও কিছু করার অনুমতি চাইছে। আল-তোভাবে ওর পিঠ চাপড়ে সম্মতি দিলাম।

মাটি শুঁকতে শুঁকতে স্ক্যাটরা পায়ে পায়ে নালার দিকে এগিয়ে গেলো। আমরা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওকে অনুসরণ করলাম। যে জায়গায় কিনারাটা খাড়া কম—সেখান দিয়ে আমরা নালার ভেতর নামলাম। নামার সময় ললি সারাক্ষণ আমার হাত ধরে রেখেছিলো।

নালার ভেতর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে স্ক্যাটরা দাঁড়ালো। চারপাশে শুঁকে সামনের পায়ের নখ দিয়ে এক জায়গায় মাটি আঁচড়াতে লাগলো। আসার পথে বাবু একটা ডাল ভেঙে লাঠির মতো করে নিয়েছিলো। সেটার মাথা দিয়ে স্ক্যাটরাকে মাটি খুঁড়তে সাহায্য করলো।

সামান্য খুঁড়তেই মাটির তলা থেকে সাদা যে বস্তুটি বেরুলো দেখে আমরা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের চোখের সামনে মানুষের কঙ্কালের একটা মাথার খুলি দাঁত বের করে হাসছে। স্ক্যাটারা সামনের পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওটাকে গর্তের বাইরে এনে গড়িয়ে দিলো। কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো টুনির চেহারা। কোনো রকমে বললো, 'ললিপা, শিগগির চলো।'

হঠাৎ বাবু চাপা গলায় বললো, 'এদিকে তাকিয়ে দেখো। জুতো পরা পায়ের ছাপ।'

তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। দু'জোড়া জুতো, দুটোর তলা দু রকম—এলোমেলো কিছু ছাপ ফেলে কিছুদূর গিয়ে শুকনো ঘাসের ভেতর হারিয়ে গেছে। জুতোর ছাপ দেখে সাহস ফিরে পেলাম। 'অতৃপ্ত আত্মারা নিশ্চয়ই জুতো পায়ে ঘুরে বেড়ায় না।' এই বলে কঙ্কালের মাথাটা আমি তুলে নিলাম।

টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আমার ভীষণ ভয় করছে ললিপা। প্লীজ আবির, আমি বাসায় যাবো।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে খুলিটা মুড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'চলো তাহলে, একটা দরকারি সূত্র পাওয়া গেলো।'

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আমরা ফিরে চললাম। জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে খোলা মাঠে নামার পর টুনি স্বাভাবিক হলো। আমাকে বললো, 'এই ঘেন্নার জিনিসটা আপনি বাসায় নিয়ে যাবেন?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'এটা আমাদের একটা ক্লু।'

বাবু বললো, 'তুমি কেন ভয় পাচ্ছো টুনি? এটা আমাদের ঘরে থাকবে।'

টুনি মুখ কালো করে বললো, 'জানি, আমাদের ভয় দেখাবার জন্য ওটা নিয়েছো। নেলী খালাকে সব বলে দেবো।

নির্বিকার গলায় বাবু বললো, 'বলতে পারো, যদি আমাদের দল থেকে বাদ পড়তে চাও।'

'আমি আর ললিপা আলাদা ঘুরবো।' টুনির গলায় চাপা অভিমান।

ললি বললো, 'টুনি তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো। ওরা কেউ তোমাকে ভয় দেখাবে না। নেলী খালাকে কিছু বললে তিনি সবার বাইরে ঘোরা বন্ধ করে দেবেন।'

বাবু কি যেন বলতে যাবে, হঠাৎ গরগর করে উঠলো স্ক্যাটরা। আশেপাশে বাতাসে কি যেন শুঁকলো। তারপর তীরবেগে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো। আমরা হতভম্ভ হয়ে একে

অপরের দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই স্ক্যাটরার গর্জনের সঙ্গে—'ওরে আল্লারে, আমারে খাইলাইছে রে,' বলে সেদিনের সেই লিকপিকে লোকটা ছুটে এলো আমাদের কাছে।

'আমারে আফনারা জুতা দিয়া মারুকা। আমার কুন দোষ নাই। তারার কতা না হুনলে আমার বৌ বাচ্চাকে জানে মারি ফালাইব।'

লোকটাকে দেখে স্ক্যাটরা খুবই রেগে গিয়েছিলো। মৃদু গলায় ধমক দেওয়ার পর ওর গরগর করা থামলো। আমি শক্ত গলায় বললাম, 'সেদিন পালিয়েছিলে কেন?'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো লোকটা—'আমি গরিব মানুষ। খয়দিন ধরিয়া কোনো কাম কাজ ফাইরাম না। আমারে খইছে আফনার খই খই যাইন খার লগে মাতেন সব তারারে গিয়ে খইতাম।'

'তারা কে? সত্যি কথা না বললে তোমার বিপদ আছে।'

'আমারে মাফ করিয়া দিলাউকা।' কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললো, 'তারার নাম আমি জানি না। অনেক দিন ধরিয়া পাথারিয়া ঘুরাফিরা খরের দেখি।'

'তোমার নাম কি, বাড়ি কোথায়, সত্যি করে বলো। 'নইলে এটার হাতে ছেড়ে দেবো।' বলে স্ক্যাটরার দিকে ইঙ্গিত করলাম।

স্ক্যাটরা ভারি গলায় বললো, 'ঘেউ।'

আঁতকে উঠে লোকটা বললো, 'আমার নাম আফাজুদ্দিন। বাফর নাম কলিমুদ্দিন। বাড়ি গোলাফগঞ্জে। ইটাগঞ্জ বাগানে আমার ভাইর লগে থাখি। আমার বৌ ব্যাটা তারার ঘরে খাম করে।'

'ওরা কোথায় থাকে?'

লোকটা পুব দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো—'হউ জঙ্গলের ভিতর ঘর বানাইয়া তারা চাইর জন থাখে আর খয়েকজন মাঝে মাঝে তারার কাছে আয়।'

'তুমি রাতে কোথায় থাকো?'

'খুনদিন আমার ভাইর বাসাত, কুনদিন তারার বাসাত।'

'তাদের কাজটা কি?'

'জায়গা জমি মাপে আর ল্যাখাপড়া করে।'

'তারা কি এখানকার স্থানীয় লোক?'

'তারা খেউ এখানকার মানুষ না। সিলটি মানুষ অত খরাপ হয় না।'

'ওরা খারাপ কেন?'

'আমারে তারা খইছে, তারার খথা মতন খাম না খরলে আমার বৌ ব্যাটারে মারি ফালাইবো। আফনারা কউকা আমি এখন খিতা খরি।'

লোকটার কথা শুনে মনে হলো শক্তিশালী কোনো দল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখছে। লোকটাকে আর হাতছাড়া করা যাবে না। বললাম, 'চলো আমাদের সঙ্গে। জাহেদ মামা ঠিক করবেন, তোমাকে নিয়ে কি করা যায়।'

'আল্লার দোয়াই আমারে আফনারা ছাড়ি দেউকা। তারা আমার বৌ পোয়া পুয়ি মারি ফালাইবো।' বলে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো শুঁটকো লোকটা। ওর কান্না দেখে স্ক্যাটরা পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো।

ললি বললো, 'তুমি কাঁদছো কেন? জাহেদ মামা তোমাকে কিছুই করবেন না। তুমি যদি ভালো লোক হও তোমার বৌ ছেলেকে তিনিই ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে দেবেন।'

ললির কথায় কান্না থামালো লোকটা। ওকে আগে আগে হাঁটতে বলে আমরা জাহেদ মামার ক্যাম্পের পথে এগুলাম।

লোকটা যাতে না বোঝে বাবু ইংরেজিতে বললো, 'লোকটাকে দেখে যতো নিরীহ মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়।'

টুনি বললো, 'ইচ্ছে করছে শয়তানকে একটা থাপ্পড় মারি।'

লোকটা একবার হঠাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরার 'ঘেউ' শুনে সোজা হয়ে গেলো।

জাহেদ মামার ক্যাম্পে পৌঁছতে পাঁচটা বেজে গেলো। বিকেলের সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। জাহেদ মামা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের সঙ্গে লোকটাকে দেখে অবাক হলেন—'এটাকে কোথায় পেলে?'

'জঙ্গলের ধারে। কারা নাকি ওকে বলেছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য। মনে হচ্ছে বড়ো কোনো গ্যাং আছে। এটাকে ছাড়া ঠিক হবে না।'

আমার কথা শুনে সঙ্গের অফিসারটিকে ডেকে তিনি বললেন, 'একে জেরা করতে হবে।' তারপর আমাদের বললেন, 'ভালো কাজ করেছো। সন্ধে হতে চলেছে। এবার ঘরে ফিরে যাও।'

বিকেলের চা নিয়ে নেলী খালা আর নানু লনে বসে গল্প করছিলেন। দূর থেকে নানুকে দেখেই আমি রুমালে বাঁধা মড়ার খুলিটা বুড়ো ছাতিম গাছটার খাঁজের ভেতর লুকিয়ে ফেললাম। টুনি মুখ টিপে হেসে বললো, 'কেমন জব্দ!'

আমাদের দেখে নেলী খালা মৃদু হাসলেন—'বাইরে ঘুরতে বেরুলে বুঝি আর ফেরার কথা মনে থাকে না!'

'আমরা ওই উচ্চিংড়িটাকে খুঁজে পেয়েছি।' তড়বড় করে বললো টুনি। 'জাহেদ মামারা ওটাকে জেরা করবেন।'

'উচ্চিংড়ি কে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন নেলী খালা।

বাবু বললো, 'পিকনিকের দিন যে শয়তানটাকে ধরেছিলাম। আজও আমাদের ওয়াচ করছিলো। টের পেয়ে স্ক্যাটরা ধরে ফেলেছে।'

স্ক্যাটরা নানুর পাশে বসেছিলো। আহ্লাদে ওর জিবের অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে। নানু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'পাকড়াশী আবার পাথারিয়া পর্যন্ত আসে নি তো?'

'আসতে পারে।' জবাব দিলেন নেলী খালা। 'তবে এখানকার স্থানীয় লোকেরা ওকে পাত্তা দেবে বলে মনে হয় না।'

'ওর টাকার অভাব নেই। প্রতিপত্তিও কম নয়।'

'আমরা এখানে নুলিয়াছড়ির মতো অসহায় নই।'

হঠাৎ নানুর মনে হলো আমাদের সামনে এসব আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। 'ছেলে-মেয়েদের খেতে দাও নেলী।' এই বলে তিনি উঠে ঘরে গেলেন।

নেলী খালা ঘরে বানানো কেক কাটতে কাটতে মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে নুলিয়াছড়ির মতো এ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়াচ্ছো। আমাকে আবার পাথারিয়া ছাড়তে হবে না তো?'

একটু আগে নেলী খালা যে কথাটা নানুকে বলেছিলেন বাবু ঠিক সে কথাটাই আবার বললো, 'আমারা এখানে নুলিয়াছড়ির মতো অসহায় নই নেলী খালা।'

'দেবো এক থাপ্পড়, পাজি ছেলে!' বলে হেসে ফেললেন নেলী খালা। আমরা সবাই ওঁর সঙ্গে গলা মেলালাম।

রাতে খাবার টেবিলে জাহেদ মামা ভীষণ এক খারাপ খবর শোনালেন। আমরা আগেই খেতে বসেছিলাম। জাহেদ মামা মুখ হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসে বললেন, 'আফাজউদ্দিন আবার পালিয়েছে।'

'সে কি!' বলতে গিয়ে বিষম খেলাম আমি।

নানু বললেন, 'এসব কথা খাওয়ার পরে হবে।'

নেলী খালার এতো সব উপাদেয় রান্না কিছুই মুখে রুচলো না। উচ্চিংড়ি পালিয়েছে শুনে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেছে। কোনোরকমে খেয়ে উঠে ড্রইং রুমে বসে জাহেদ মামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। নানু আর জাহেদ মামা খাওয়া শেষ করে এক সঙ্গে উঠলেন।

সোফায় বসে পাইপ ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে নানু বললেন, 'আফাজউদ্দিন পালালো কিভাবে?'

আমাদের একজন অফিসার ওকে জেরা করে জনা তিনেক জওয়ান আর একজন হাবিলদারকে ওর সঙ্গে পাঠিয়েছিলো আসল কালপ্রিটগুলোকে ধরার জন্য। জঙ্গলের বাইরে জীপ রেখে ওরা ভেতরে ঢুকেছে। একটু পরে আফাজউদ্দিন বললো, সঙ্গে সেপাই দেখলে ওরা সন্দেহ করতে পারে, তাই ও আগে গিয়ে দেখে আসতে চায় ওরা কে কিভাবে আছে। যেভাবে ও পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে যাচ্ছিলো ওরা ভেবেছিলো এ বুঝি আমাদের কোনো ইনফর্মার। তাই ওর কথা শুনে ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লোকটা যখন ফিরে এলো না তখন আর কিছু করার ছিলো না।'

নানু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না জাহেদ, উর্দিপরা লোকদের মাথা মোটা বলে জানি, কিন্তু এতোটা গর্দভ কখনও ভাবি নি।'

জাহেদ মামা কাঁচুমাচু করে বললেন, 'আসলে একটু কম্যুনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছিলো। আমার অফিসারের উচিত ছিলো লোকটার ব্যাপারে হাবিলদারকে আগে বলে দেয়া—'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'লোকটার বুদ্ধিরও প্রশংসা করা উচিত আব্বু। আর্মির চারটা লোককে কিভাবে বোকা বানালো!'

'বেকুবদের বোকা বানানোর ভেতর বাহাদুরি কোথায়?' এই বলে নানু উঠে চলে গেলেন। মনে হলো বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

দুদিনের বাসি খবরের কাগজে একটু চোখ বুলিয়ে জাহেদ মামাও গম্ভীর মুখে ঘরে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে নেলী খালাও।

আমরা চারজন বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বাবু বললো, 'উচ্চিংড়ি পালানোতে মনে হচ্ছে আমাদের তদন্ত আবার শুরু থেকে করতে হবে।'

'কিসের তদন্ত?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো টুনি।

'উচ্চিংড়িকে কারা আমাদের পেছনে লাগিয়েছে। রাতের অন্ধকারে বর্ডারের পাহাড়ে কারা আলো, জ্বেলে সিগন্যাল দেয়। প্রফেসরের ম্যাপ কে চুরি করেছে।'

বাবুর সঙ্গে আমি যোগ করলাম—'লাল পাহাড়ের ভেতর কারা ধুপ-ধুপ শব্দ করে, নালার ভেতর পায়ের ছাপ কাদের, মড়ার খুলিটাই-বা কার, এসবই জানা দরকার।'

টুনি বললো, 'মড়ার খুলি আর কার হবে। যারা পঞ্চাশ বছর আগে খনির তেল তুলতে গিয়ে মারা গিয়েছিলো নিশ্চয় ওদের কারো হবে।'

'না টুনি।' আমি বললাম, 'খুলিটা মোটেই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো নয়। বেশি হলে দু'তিন বছরের হবে। আমি ভালো করে দেখেছি, একেবারে তাজা।'

'তাহলে অতৃপ্ত আত্মারা কাউকে মেরে নালার ভেতর পুঁতে রেখেছিলো।' ভয়ে ভয়ে কথাটা বললো টুনি।

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কেউ বোধ হয় চায় না আমরা লাল পাহাড়ের কাছে যাই। তাই মড়ার খুলিটা ওখানে লুকিয়ে রেখেছে!'

বাবু বললো, 'অন্য উদ্দেশ্যেও রাখতে পারে। হয়তো খুলিটা ওদের কোনো মেসেজ। ওটার ভেতর কোনো সংকেত আছে কিনা দেখা দরকার। চলো আবির, নিয়ে এসে দেখি।'

টুনি বাবুর হাত আঁকড়ে ধরে কঁকিয়ে উঠলো—'না, ওটা এখানে আনতে পারবে না।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'এখন থাক বাবু। আমাদের ঠিক করতে হবে তদন্ত কোত্থেকে শুরু করবো।'

'একটা জায়গায় এখনো আমরা যাই নি।' ললি আমার দিকে তাকালো।

'কোথায়?' প্রশ্ন করলাম ললিকে।

'যেখান থেকে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে। কাল আমরা ওদিকটায় গিয়ে দেখতে পারি।'

'ওখানে যেতে গেলে লাল পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে।'

'ওই দেখ, আবার।' উত্তেজিত হয়ে বললো বাবু। তাকিয়ে দেখি রোজকার মতো আলোর সংকেত। ব্যতিক্রম হচ্ছে—দুবার নয়, পাঁচবার দেখানো হলো উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশে সার্চ লাইটের তীব্র আলো। বাবু বললো, 'কালই খুঁজে বের করবো এ কাজ কাদের!'

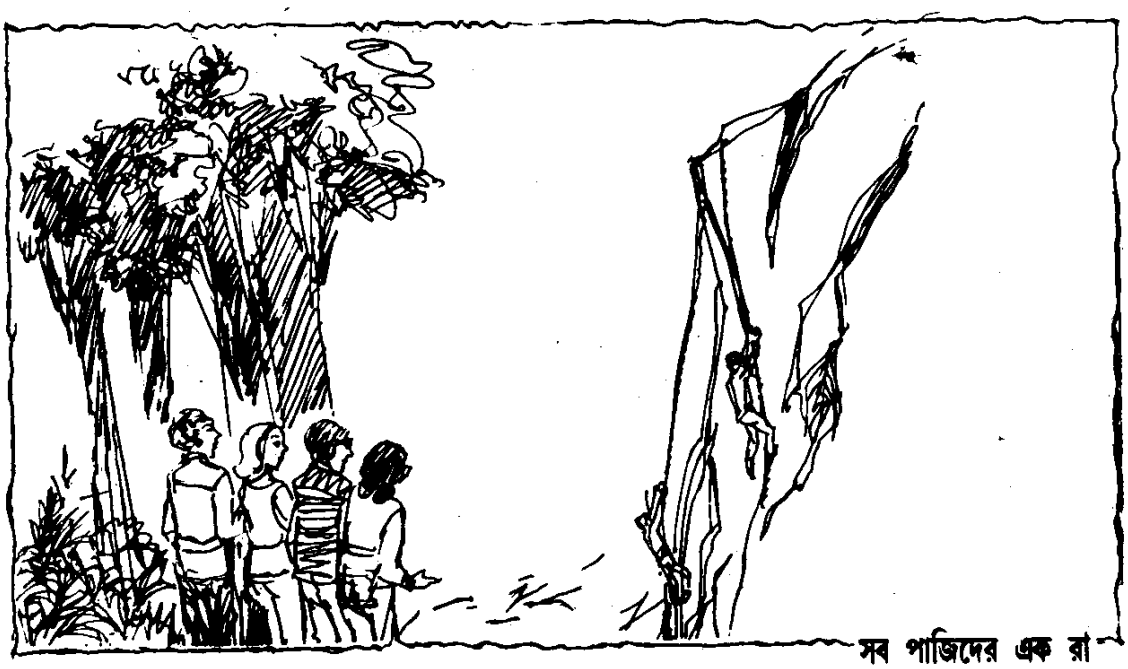

সব পাজিদের এক রা

'যেখানে খুশি যাও, দুপুরে সময়মতো যেন খাবার টেবিলে দেখতে পাই।' সকালে নাশতা খেয়ে বেরুবার সময় নেলী খালা ও কথা বলে আমাদের বিদায় দিলেন। আমাদেরও দেরি

করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। জঙ্গল পেরিয়ে লাল পাহাড়ের নিচে এসে যখন পৌঁছলাম ঘড়িতে তখন মাত্র সকাল সাড়ে নয়টা।

স্ক্যাটরা আমাদের সঙ্গে আসে নি। নেলী খালা ওকে বকেছেন, 'রোজ রোজ এতো কি বেড়ানো? দু তিন দিন ধরে যে গা ধোয়া হচ্ছে না, সে খেয়াল আছে?' বকুনি খেয়ে মুখ গোমড়া করে স্ক্যাটরা বারান্দায় বসেছিলো। আমাদের বেরুনোর সময় ফিরেও তাকায় নি।

পাহাড়ের ভেতর থেকে ধুপ-ধুপ ভৌতিক শব্দটা আগের মতোই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। কিশোরদার গল্পের কথা মনে হলো, প্রফেসর হাবিবের ধানবাদের ঘটনাও। মনে হলো, কয়েকশ মানুষের হার্টবিট এক হাজার গুণ জোরে বেরিয়ে আসছে লাল পাহাড়ের বুকের ভেতর থেকে। রীতিমতো গা ছমছম ব্যাপার। ললিকে বললাম, 'পাহাড় বেয়ে উঠতে পারবে তো?'

মৃদু হাসলো ললি—'নুলিয়াছড়িতে এর চেয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠি নি?'

তবু ললির কষ্ট হবে ভেবে একটু কম খাড়া জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পোড়া মবিলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বাবু বললো, এটা যদি আগ্নেয়গিরি হয়, কি হবে বলতো?'

'ভূগোলে কখনো পড়ি নি, এখানে আগ্নেয়গিরি আছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হলে না হয়—' কথা শেষ করার আগেই উঁচু কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেলাম আমি।

হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে কোনোরকমে সামলে নিলাম। 'কি হলো?' বলে এগিয়ে এলো ওরা সবাই।

তাকিয়ে দেখি ভারি লোহার এ্যাঙ্গেলের মতো কি যেন মাটির ভেতর থেকে ইঞ্চি ছয়েকের মতো বেরিয়ে রয়েছে। ঘাসে ঢাকা ছিলো বলে বুঝতে পারি নি। বাবু বললো, 'এ জিনিস এখানে এলো কোত্থেকে?'

'কেন, সেদিন প্রফেসর কি বললেন শোন নি? এখানে যারা তেলের খনি খুঁজতে এসেছিলো, তাদের কিছু হতে পারে।' এই বলে হোঁচট খাওয়া পাটা ঝেড়ে নিলাম।

যত ওপরের দিকে যাচ্ছিলাম, লোহার টুকরো আর ইট ভাঙা দেখতে পেলাম। আধঘণ্টা হাঁটার পর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখি লোহার বড়ো বড়ো ভাঙা যন্ত্রপাতি বুনো লতা জড়িয়ে পড়ে আছে। দেখলেই মনে হয় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার পুরু হয়ে মর্চে জমেছে।

ললির জন্য পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিলাম পাহাড়ের চূড়ায় বসে। প্রফেসরের জন্য বাবু আর টুনি কতগুলো পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিলো। নামতে গিয়ে তেমন কোনো অসুবিধে হলো না। পাহাড়ের এ পাশটায় গাছপালা বেশি। কয়েকটা মনে হলো একশ বছরেরও বেশি পুরোনো। একটুখানি ফাঁকা জায়গায় এসে সামনে তাকিয়ে দেখি, খানিক খোলা জায়গার পর আবার পাহাড় শুরু হয়েছে। এরপর পুব দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কালচে সবুজ গাছপালা। মনে হয় মানুষের পায়ের ছাপ কোনোদিন সেখানে পড়ে নি।

হঠাৎ টুনি উত্তেজিত হয়ে বললো, 'ওই দিকে দেখো, ওরা কারা?'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি দূরের একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে প্যাণ্ট, শার্ট পরা দুজন লোক উঠছে। এত দূরে যে—চেহারা চেনা যাচ্ছিলো না। বাবু বললো, 'ইশ, বাইনোকুলারটা যদি নিয়ে আসতাম।'

বাবু আমেরিকা থেকে একটা বাইনোকুলার এনেছিলো, ওটা এখন ঢাকায়, আমাদের রূপলাল লেনের পুরোনো বাড়িটার চিলেকোঠার ঘরে।

ললি বললো, 'পরনের কাপড় দেখে তো মনে হচ্ছে সার্ভে টিমের কেউ।'

আমি বললাম, 'জায়গাটা কিন্তু সার্ভের এলাকার বাইরে।'

'তাতে কি! এলাকার বাইরে যেতে কেউ বারণ করেছে নাকি ওদের?' এমনভাবে বাবু কথাটা বললো, এরপর আমরা কেউ আর উচ্চবাচ্য করলাম না।

'লাল পাহাড় পেরিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলাম—তখনই ঘটলো এক অঘটন। বাবু আর টুনি হাঁটছিলো সামনে, আমি আর ললি পেছনে। তাড়াতাড়ি হাঁটলে ললির কষ্ট হয়। আমি ওকে বলতে যাচ্ছিলাম বুকে ব্যথা হচ্ছে কিনা ঠিক তখনই হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবুর আর্তচিৎকার। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি বাবু আর টুনি চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। চোখের সামনে দুজন মানুষ কর্পূরের মতো উবে গেলো—আমি আর ললি বিস্ময়ে হতবাক। একটু পরেই শুনি মাটির তলায় খচমচ শব্দ আর বাবুর চিৎকার—'আবির, আমরা এখানে।'

কয়েক পা এগিয়ে সামনে যেতেই দেখি বাবু আর টুনি আট দশ হাত নিচে একটা কূয়োর মতো গর্তের ভেতর, যার মুখটা জংলী ঘাস লতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে। তলায় শুকনো পাতা পুরু হয়ে জমেছিলো বলে ওদের বেশি লাগে নি। হঠাৎ এভাবে পড়ে যাওয়াতে ওরা দুজনও হতভম্ভ হয়ে গেছে। ললিকে দেখে টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'ললিপা, আমার স্যাণ্ডেল পাচ্ছি না।'

বাবু বললো, 'এখানে কোথাও পড়েছে, খুঁজে দেখো।'

স্যাণ্ডেল খুঁজে পেয়ে আবার টুনির নাকি কান্না—'আমাদের এখান থেকে বের করছো না কেন তোমরা?'

আমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম গাছের শক্ত ডাল কিম্বা মোটা কোনো লতা পাওয়া যায় কিনা। একটু দূরে ললিই দেখালো, দুটো শুকনো ডাল পড়ে আছে। শক্ত কিনা পরখ করে ও দুটো কুয়োর ভেতর কোণাকুণি করে নামিয়ে দিলাম। যথেষ্ট বড়ো না হওয়াতে আমাকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হলো। বললাম, 'একজন একজন করে উঠে এসো, আমি টেনে তুলছি।'

ললিও আমার পাশে বসে পড়েছে। গর্তের তলা থেকে বাবু বললো, 'টুনিকে আগে তোল। টুনি স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নাও।'

ঠিক তখনই অনুভব করলাম লোহার সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে আমার ঘাড়ের ওপর ধরে কে যেন আমাকে শূন্যে তুলতে তুলতে বলছে, 'থাক থাক, এতো কষ্ট করতে হবে না। আমরাই তোমার বন্ধুদের টেনে তুলবো।'

চমকে উঠে এক ঝটকায় ছাড়াতে যাবো, ঘাড়ের ওপর চাপটা আরো বেড়ে গেলো। মনে হলো আমার ঘাড়টা বুঝি পাটখড়ির মতো পট করে ভেঙে যাবে। শূন্যে হাত-পা ছোঁড়া ছাড়া কিছুই করার ছিলো না। কোনো রকমে তাকিয়ে দেখি সাত আটজন লোক, মুশকো গুণ্ডা চেহারা, দাঁত বের করে হাসছে। ললির হাতও একজনের হাতে ধরা।

'কত্তা ভারি খুশি হবেন চার বিচ্ছুকে একসঙ্গে পেলে।' ওদের ভেতর কে যেন বললো।

আরেকজন বললো, 'কতদিন ভালোমন্দ খাই না। আজ এদের কল্যাণে মনে হয় বিলেতি মাল জুটবে।'

একজন লাফ মেরে গর্তে নামলো। বুলডগের মতো থ্যাবড়ামুখো একজন বাবু টুনিকে টেনে তুলে আনলো।

ছুঁচোমুখো একজন বললো, 'আর দেরি কেন? চলো ইনামটা এ বেলা নিয়ে নি। কত্তা কখন কোন মেজাজে থাকে বলা যায় না। খাকি শয়তানগুলো কম হেনস্তা করে নি কত্তাকে।'

একজনের কাছে দড়ি ছিলো। আমাদের চারজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে বললো, 'ভাগ্যিস হারামজাদা কুত্তোটাকে আনে নি।'

থ্যাবড়ামুখো বললো, 'আনলে কি হতো, ভোজালি দিয়ে পেটটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতাম না?'

ছুঁচোমুখো আমাদের বললো, 'পা চলে না কেন ইবলিশের দল? ধোলাই কি এখান থেকে শুরু করতে হবে?'

টুনির চেহারা দেখে মনে হলো এক্ষুণি বুঝি কেঁদে ফেলবে। বাবু আর ললিও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়াবার কথাইতো, হঠাৎ করে বোকার মতো এভাবে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়বো কস্মিনকালেও ভাবি নি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর থ্যাবড়ামুখো বললো, 'এবার বাছা তোমাদের চোখ বাঁধতে হবে। যদি কোনো রকমে কত্তার মতো পালাতে পারো, তাহলে যাবজ্জীবন কয়েদ আর ফাঁসির দড়ি থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।'

লোকগুলো কালো কাপড়ের টুকরো দিয়ে আমাদের সবার চোখ বেঁধে দিলো। তারপর হাত ধরে নিয়ে চললো এলোমেলো ঘুরপথ দিয়ে। কোন দিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। যারা আমাদের ধরেছে তারা যে পাকা ক্রিমিনাল এতে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। এমনভাবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলো, মনে হলো, ওদের কাছে আমারা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

এক ঘণ্টার মতো হাঁটার পর কিছু দূরে লোকজনের কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম। একটু পরে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে হাঁটতে হলো। বনের ভেতর গাছপালা আর লতা-পাতার একরকম গন্ধ পাচ্ছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর অন্য রকম একটা আঁশটে বিদ-ঘুটে গন্ধ নাকে লাগলো। একবার ডান দিকে, একবার বাম দিকে, কখনো উল্টো ঘুরে কোথায় যে এলাম কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'এবার চোখ খোলা যেতে পারে।' এই বলে একজন আমাদের চোখ খুলে দিলো। হাতের বাঁধন আগের মতোই থাকলো। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি অতি পুরোনো ভাঙা কোন বাড়ির ঘর, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ে ইট বেরিয়ে আছে, মেঝের অবস্থাও সেরকম, ছাদের কড়িকাঠ মনে হয় যে-কোনো সময়ে ভেঙে পড়বে। স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ। ভীষণ এক অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। টুনির চেহারা রক্তশূন্য, বাবু আর ললিকে মনে হলো একটা ঘোরের ভেতর আছে।

থ্যাবড়ামুখো আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দিয়েছিলো। আমাদের হতভম্ব চেহারা দেখে হ্যা হ্যা করে হায়নার মতো কুৎসিত হাসলো। টেনে টেনে বললো, 'কতদিন পর বড় কত্তার বখশিস পাবো। ইচ্ছে করছে তোদেরও ভাগ দেই।'

ছুঁচোমুখো কোথায় যেন গিয়েছিলো। ঘরে ঢুকে বললো, 'এগুলোকে নিচে নিয়ে চল। কত্তা ডাকছেন।'

থ্যাবড়ামুখো দুহাতে আমার আর বাবুর কনুই চেপে ধরলো—'চলো বাপ রাজদর্শনে।' এই বলে কনুইতে এমন জোরে চাপ দিলো ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো বাবু। আমি দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলাম। রাগে চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিলো।

পাশের ঘরের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি, নিচে অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে। শেষে সিঁড়িতে পা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। থ্যাবড়ামুখো সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে ধরে থাকাতে রক্ষা পেলাম। ললি টুনি আমাদের পেছনে ছিলো। ওদের পেছনে টর্চ হাতে ছুঁচো-মুখো।

একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থ্যাবড়ামুখো গলা তুলে বললো, 'কত্তা বিচ্ছু গুলোকে এনেছি। 'ভেতরে আসবো?'

ভেতর থেকে—'আয়, আয়,' শুনে থ্যাবড়ামুখো দরজা খুলে ভেতের ঢুকলো। ধাক্কা মেরে আমাদের ঠেলে দিলো সামনে।

চেয়ারে বসা যে লোকটা আমাদের দেখে খিকখিক করে হাসছিলো, ওকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঘরে কম পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছিলো। আলো কম হলেও পরিষ্কার দেখলাম আমাদের সামনে বসে আছে নুলিয়াছড়ির নিকুঞ্জ পাকড়াশী। হাসতে হাসতে মোলায়েম গলায় আবৃত্তির সুরে বললো, 'এসো এসো, গর্তে এসো, বাস করে যাও চারটি দিন। আদর করে শিকেয় তুলে রাখবো তোমায় রাত্রিদিন। হি-হি-হি-হি। কেমন মজা বাছাধন। নিকুঞ্জ পাকড়াশীকে তোমরা আজ্‌ও চিনতে পারো নি।' এই বলে গলার স্বর অন্য রকম করে পাকড়াশী বললো, 'আমার নাম আফাজুদ্দিন, বাবার নাম কলিমুদ্দিন। বাড়ি গোলাফগঞ্জ। ইটাগঞ্জ বাগানে আমার বাইর লগে থাকি। আমার কুন দুষ নাই। হি-হি-হি-হি।'

পাকড়াশীর কথা শুনে আমরা বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকালাম। তাহলে পাকড়াশীই কদিন ধরে আমাদের ওপর নজর রাখছিলো! দু'বার ধরার পরও ওকে আমরা চিনতে পারি নি। শরীরের কাঠামো ছাড়া গলার স্বর, চেহারা, চালচলন এমনই বদলে ফেলেছিলো যে, নেলী খালা আর জাহেদ মামা পর্যন্ত চিনতে পারেন নি শয়তানটাকে।

'তোরা আমাকে চিনিস নি, চিনেছিলো তোদের হারামজাদা কুত্তোটা। হি-হি-হি।' পাকড়াশীর কথা শুনে আর চেহারা দেখে মনে হলো আমাদের বোকা বানানোর ব্যাপারটা ও দারুণ উপভোগ করছে। টুনির দিকে তাকিয়ে মোলায়েম হাসলো— 'কি গো খুকুমণি, কেমন লাগছে! হাতে একটা বালতি ধরিয়ে দেবো নাকি! আমিও বাপু কাউকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো পছন্দ করি না।' এই বলে পাকড়াশী থ্যাবড়ামুখোর দিকে তাকালো—'মাথামোটা মেজরটাকে রাতেই চিঠি পৌঁছে দিবি।'

'দেবো কত্তা।' ঝটপট জবাব দিলো থ্যাবড়ামুখো।

'বুঝেছিস কিছু, কেন তোদের ধরেছি?' আমার দিকে তাকালো পাকড়াশী।

নেলী খালাকে জব্দ করার জন্য আমাদের ধরেছে এ কথা না জানার কি আছে। চিঠি লিখে আগে হুমকিও দিয়েছে, নেলী খালার প্রিয়জনের বিপদ হতে পারে। টুনি বললো, 'জাহেদ মামা জানতে পারলে তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'হি-হি-হি-হি।' হেসে গড়িয়ে পড়লো পাকড়াশী। যেন এর চেয়ে হাসির কথা জীবনে শোনে নি। 'আমাকে ধরবে মাথায় গোবর পোরা ওই মেজরটা! হি-হি-হি। কি যে হাসির কথা বললি ছুঁড়ি! হি-হি-হাসতে হাসতে আমার পেট ফেটে যাবে। কাল কিভাবে ওদের সব ক'টাকে লাট্টু ঘোরালাম, তোদের বলে নি বুঝি! হি-হি-হি আমি কোথায় যাবো গো!'

এই বলে একটু ধাতস্থ হলো পাকড়াশী— 'শোন বাছা, এই বেলা তোদের একটা কথা বলে রাখি। আমি না চাইলে আমাকে ধরে এমন বাপের বেটা এখনো এই পৃথিবীতে জন্মায় নি। তোদের আমি ওই মাথামোটাকে জব্দ করার জন্য আনি নি। তোদের এনেছি জিম্মি করে। কাল সকালে যদি গোবরপোরা ভালোয় ভালোয় ম্যাপটা আমাদের হাতে তুলে না দেয় তাহলে তোদের কপালে দুর্ভোগ আছে।' এই বলে শয়তানটা কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে বললো, 'হ্যাঁ, দুর্ভোগের কথা বলছিলাম। তোদের চারজনের হাতে চার দশে চল্লিশটা আঙুল আছে। তিন বেলা খাওয়ার সময় তিনটা আঙুল কেটে পাঠাবো। দেখি কতদিন সইতে পারে তোদের পেয়ারের নয়া কুটুম্ব! এই যে খুকুমণি, কাঁদছো কেন?' টুনির দিকে তাকিয়ে দেখি ওর দু'গাল বেয়ে কান্না গড়িয়ে পড়ছে। পাকড়াশী মোলায়েম গলায় বললো, 'এখনই কান্নাকাটি কেন? এখনও তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। তারপর চিঠি লেখারও সুযোগ পাবে। তারপর লটারি হবে। এমনও হতে পারে লটারিতে তোমার নাম সবার শেষে উঠবে। এখন তাহলে কেঁদো না।'

'চুপ কর শয়তান।' কাঁদতে কাঁদতে টুনি বললো, 'অসভ্য, বদমাশ! স্ক্যাটরা তোকে কুচি কুচি করে টুকরো করবে।'

ললি ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললো, 'কাঁদবে না টুনি, শয়তানটা তাহলে পেয়ে বসবে!'

মুখটা ছুঁচোলো বানিয়ে পাকড়াশী চুকচুক করলো—'ওকে বুঝিয়ে বলো বাছা! তোমরা কতো সাহসী! মনে নেই নুলিয়াছড়িতে আমাকে কিভাবে নাজেহাল করেছো! এসব কান্নাকাটি কি তোমাদের মানায়! যাও, এবার বিশ্রাম নাও গে। যা হবার কাল হবে। এই বলে গলার স্বর পাল্টে থ্যাবড়ামুখোকে বললো,' এদের নিয়ে ওপরের ঘরে আটকে রাখ। সাবধান থাকবি, এক-একটা কেউটের ছা। কিছু হলে তোদের সব কটাকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতবো।'

আমি পাকড়াশীকে বললাম, 'তুমি কি প্রফেসর ইরফান হাবিবের ম্যাপের কথা বলছো?'

চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকালো পাকড়াশী—'হ্যাঁ, ওটার কথাই বলছি, তুই জানিস কি করে?'

'ওটা তুমি পাচ্ছো না।' শান্ত গলায় আমি বললাম।

'নাকি!' পাকড়াশীর গলায় উপহাস—'মামাবাড়ি বেড়াতে এসেছিলি বটে, এটাকেও তোর মামাবাড়ি ভেবেছিস নাকি! কেন পাবো না শুনি?'

'ওটা চুরি হয়ে গেছে।'

'কি বললি?' খেঁকিয়ে উঠলো পাকড়াশী—'হিসেব করে কথা বলিস, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরেছিস তো তোর আঙুল দশটা সবার আগে কাটবো!'

'তুমি এতো কিছু জানো আর এ খবরটা রাখো না?' রাগে আমার গলা কর্কশ শোনালো—'পরশু রাতে ওটা চুরি হয়েছে। প্রফেসর নিজে এসে বলে গেছেন ক্যাম্পে আর্মির পাহারা বাড়াতে।'

'বলিস কি!' আমার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো পাকড়াশী। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর আপন মনে বললো, 'এ কাজ নির্ঘাত সিনেমা পার্টির ছোঁড়াটার কাজ। প্রথম দিনই আমার সন্দ হয়েছিলো।'

থ্যাবড়ামুখো বললো, 'কত্তা, আজও ওটাকে দেখলাম কি যেন মাপজোখ করলো। তারপর তিন নম্বর পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো। সঙ্গে কাকে যেন নিয়ে এসেছে।'

'সঙ্গে আবার কে আসবে?' ভুরু কুঁচকে পাকড়াশী বললো, 'চা বাগানের ম্যানেজার ছোঁড়া নয় তো?'

'না কত্তা, অন্য লোক। ঢাকা থেকে এসেছে। সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি এনেছে।'

ছুঁচোমুখো এতোক্ষণ কোনো কথা বলে নি। আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। থ্যাবড়ামুখোর কথা শেষ হওয়ার পর বললো, 'আমার মনে হয় কত্তা আপনি ঠিকই ধরেছেন। সিনেমাঅলাই ওটা হাতিয়েছে। কাল রাতে দু নম্বর পাহাড় থেকে অনেকক্ষণ সিগন্যাল পাঠিয়েছে।'

ছুঁচোর কথা শুনে রীতিমতো চমকে উঠলাম। কিশোরদা এ কাজ করতে পারে এটা কিভাবে বিশ্বাস করি! অথচ এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের ভাঁওতা দিয়েছে কিশোর পারেখ।

'হারামজাদা তাহলে এই মতলবে এসেছে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো পাকড়াশী। 'মজা দেখাচ্ছি! জগা শোন, তোরাবালিকে বল এখনই ওপারের ক্যাম্পে গিয়ে বোঝাপড়া করে আসতে। কথা বলেছে আমার সঙ্গে, মাল ডেলিভারি দেবো আমি। মাঝখান থেকে সিনেমাঅলা ছোঁড়া আসে কেন শুনি? উল্টো সিধে কিছু বললে, খরচার কথা তুলবি। এক-মাসে আমার ব্যবসায় কম ক্ষতি হয় নি। তোরাবালিকে বলবি, যাবে আর আসবে, দেরি যেন না হয়।' এই বলে একটু থামলো পাকড়াশী। তারপর থ্যাবড়ামুখোকে বললো, 'এগুলোকে নিয়ে আটকে রাখ। চিঠি পাঠানোর দরকার নেই। মেজরের সঙ্গে আমার অন্য বোঝাপড়া আছে। তার আগে সিনেমাঅলার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।'

দোতালার ওপরের যে কামরাটা দরজা জানালা সমেত অক্ষত ছিলো সেখানে আমাদের চারজনকে রেখে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিলো থ্যাবড়ামুখো। আমাদের হাত তখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। একেবারে অবশ হয়ে গেছে।

থ্যাবড়ামুখো চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ রইলাম। তারপর বাবু বললো, 'আবির, তোমার কি মনে হয় প্রফেসরের ম্যাপ কিশোর পারেখ চুরি করেছে?'

'এদের কথায় তাই তো মনে হচ্ছে।'

আমার সঙ্গে ললি যোগ করলো, 'নইলে ও লোক সকালে ওরকম খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে যাবে কেন? ওর তো এখন ঢাকায় থাকার কথা।'

আমি বললাম, 'সঙ্গে অন্য লোক ছিলো। তার মানে মনিদা এসব জানে না।'

'ম্যাপটা তাহলে সত্যি সত্যি হাতছাড়া হয়ে গেলো।' বাবুর গলায় হতাশা।

ম্লান হেসে ললি বললো, 'প্রফেসর ঠিকই অনুমান করেছিলেন, ইণ্ডিয়ানরাই ওর ম্যাপ চুরি করিয়েছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' একটু ভেবে বললাম আমি।

'কেন, তোমার কি মনে হয়?' জানতে চাইলো ললি।

'পাকড়াশীর কথা শুনে তো মনে হলো ইণ্ডিয়ানরা ওকে লাগিয়েছে এ কাজে। কিশোর পারেখ অন্য কোনো দেশের হয়ে এ কাজ করতে পারে।'

'অন্য দেশের স্বার্থ কি?'

'আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াই, এটা পাকিস্তানও চাইবে না।'

'তুমি বলতে চাও কিশোর পারেখ পাকিস্তানী এজেন্ট?'

'হতে পারে।'

টুনি এতোক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলো। ও ছিলো কিশোর পারেখের বেশি ভক্ত। তার এই অধঃপতনে টুনির সবচেয়ে মন খারাপ করবে এতো জানা কথা। মুখ কালো করে বললো, 'কে কার এজেন্ট এসব নিয়ে পরেও তো ভাবা যাবে। এখান থেকে বেরুবো কিভাবে সেটা আগে ভাবো।'

আমি বললাম, সেটাও ভেবেছি টুনি। দিনের বেলায় এখান থেকে বেরুনো যাবে না। বেরুতে হবে রাতে। আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে পাকড়াশীরা কিশোর পারেখকে ধরার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবে।

বাবু বললো, 'কিশোর পারেখ ম্যাপ চুরি করে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? ওর তো পালিয়ে যাওয়ার কথা!'

ললি বললো, 'বোধ হয় চেক করে দেখছে সব ঠিক আছে কিনা।'

'তার মানে সেও একজন জিওলজিস্ট?'

'হতে পারে।' আমি বললাম, 'তবে সিনেমা সম্পর্কে ভালো খোঁজ-খবর রাখে।'

'ওটা স্পাইদের রাখতে হয়।' বাবু বললো, 'পাকড়াশী আমাদের যতো না বোকা বানিয়েছে তার চেয়ে বেশি বোকা বানিয়েছে শয়তান কিশোর পারেখ।'

টুনি বললো, 'এ সময় স্ক্যাটরা যদি থাকতো।'

'স্ক্যাটরা থাকলে আমরা ধরা পড়তাম না।' ম্লান হেসে বললো ললি।

ঘরটার একপাশের দেয়ালে মোটা লোহার শিকওয়ালা জানালা। বাইরে দুপুরের আকাশ ঝকঝক করছে। কয়েকটা চিল ভেসে বেড়াচ্ছে সেই খোলা আকাশে। নেলী খালা ভাবতেও পারবেন না পাথারিয়ার, গভীর জঙ্গলের এক পোড়ো বাড়িতে আমরা চারজন পাকড়াশীর হাতে বন্দি হয়ে পড়ে আছি। এক ঝাঁক সবুজ টিয়াপাখি টি টি করে ডাকতে ডাকতে ঝটপট উড়ে গেলো জানালা পাশ দিয়ে।

পাখি উড়ে গেলো শেষে

পাকড়াশী অতি শয়তান লোক এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেদিন ও আমাদের

সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে নি। দুপুরে থ্যাবড়ামুখো আর এক চিমসে বুড়ি এসে আমাদের হাতের বাঁধন খুলে একজন একজন করে নিচের কুয়োতলায় নিয়ে গেছে। বালতিতে করে পানি তুলে দিয়েছে মুখ হাত ধোয়ার জন্য। তারপর বুড়ি থালায় করে ভাত এনে দিয়েছে।

রাগে-দুঃখে খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না। তবু খেতে হলো, শরীর দুর্বল হলে কিছু করা যাবে না ভেবে। টুনি থ্যাবড়ামুখোর অগোচরে বুড়িকে চুপি চুপি বলেছিলো, 'আমাদের যদি যেতে দাও, তোমাকে অনেক টাকা দেবো।'

'না রে মা!' বুড়ি বিষন্ন গলায় জবাব দিয়েছে—'নিকুঞ্জ মশাইর নেমক কম খাই নি। আজ বাদে কাল চিতেয় উঠবো, ধম্মে সইবে না। টাকা দিয়ে কি করবো! তোমরা কি আর আমার সঙ্গে নরকে যাবে?'

বুড়ির ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনে গা জ্বলে গেলো। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'নিকুঞ্জ পাকড়াশী যখন আমাদের একটা একটা করে আঙুল কাটবে— সেটা বুঝি খুব ধর্মের কাজ হবে?'

'তা কেন কাটবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো বুড়ি।

'জিজ্ঞেস করো গে তোমাদের নিকুঞ্জ মশাইকে?'

'নিকুঞ্জ মশাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?' থ্যাবড়ামুখো এসে বললো, 'আমি বলছি মাসি, এই বাছাধনরা কত্তার পেটে লাথি মেরেছিলো। শোন নি কি হয়েছিলো নুলিয়াছড়িতে! এরাই হচ্ছে সেই কেউটের ছানারা। কত্তা কি সাধে রেগেছেন!'

'তবে!' বুড়ি আমাদের আঙুল কাটার মস্ত বড়ো যুক্তি খুঁজে পেলো—'কত্তার দয়ার শরীর বলে শুধু আঙুল কাটছেন। আমি হলে কখন আঁশবটি দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিতাম!'

'মর তুই ডাইনি বুড়ি।' রেগেমেগে বললো টুনি।

থ্যাবড়ামুখো আর বুড়ি খি খি হেসে খাবার থালা বাসন নিয়ে দরজা আটকে দিয়ে চলে গেলো। কুয়োতলায় যাওয়ার সময় লক্ষ করেছি পাকড়াশীর এই আস্তানায় কম করে হলেও ষাট সত্তর জন লোক হবে। চেহারা দেখে মনে হয় সব কটা জেল পালানো আস্ত খুনী।

সন্ধের পর পোড়ো-বাড়ির লোকজনদের ভেতর বেশ ব্যস্ততা লক্ষ করলাম। দুপুরে খাওয়ার পর থ্যাবড়ামুখো আমাদের হাত আর বাঁধে নি। বুড়িটা অবশ্য বলেছিলো বাঁধতে, থ্যাবড়া বলেছে, 'পালাবে কোথায়, দোরগোড়ায় দু দুটো পাহারাদার বসিয়ে রেখেছি না!' যাবার সময় ঘরের কোণে একটা মাটির কলসি আর টিনের গম রেখে গেছে, যদিও আমাদের খিদে-তেষ্টা কিছুই ছিলো না।

রাত আটটার দিকে চিমসে বুড়ি খাবার আনলো। টিনের থালায় ভাত আর বাটিতে ঠাণ্ডা তরকারির মতো কি যেন একটা। বললো, 'খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, নেদো এসে মাদুর বালিশ দিয়ে যাবে। ক্যাঁতা-ফ্যাতা দিতে পারবো না। গায়ে ম্যালা কাপড় আছে, জানালা বন্ধ করে শুলে শীত লাগবে না।'

জোর করে কোনো রকমে একটুখানি খেলাম। বাবু, ললি, টুনিকে আগেই বলে রেখেছিলাম খাবার নিয়ে খুঁত খুঁত না করতে। রাতে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। দৌড়াতেও হবে। দুর্বল শরীরে পালানো যাবে না। খেতে খেতে দেখলাম ওরাও মুখ কালো করে বিস্বাদ তরকারি দিয়ে ঠাণ্ডা শক্ত ভাত খেলো। তবে কেউই অর্ধেকের বেশি খেতে পারলাম না।

বুড়ি থালা গোছাতে গোছাতে গলা তুলে ডাকলো—'নেদো, এখনো মাদুর বালিশ দিয়ে গেলি না?'

একটু পরেই মুশকো কালো ষণ্ডামতো একটা লোক মাদুর আর বালিশ নিয়ে এলো। বালিশ না বলে থান ইট বললে ঠিক হতো। পাথরের মতো শক্ত কালো তেলচিটে কাপড়ের চারটে ঢেলা আর দুটো ছেঁড়া মাদুর— পাকড়াশী পাঠিয়েছে আমাদের শোয়ার জন্য। এ নিয়ে আমরা কোনো কথা বললাম না। দুপুরের মতো বুড়ি থালা বাটি গুছিয়ে আলোটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দরজার কাছে যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিলো নির্বিকার মুখে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে খট করে তালা আটকে দিলো।

সারা বাড়িতে লোকজনের বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। সন্ধের ঠিক পর পরই কুয়োতলার কাছে পনেরো ষোলজন লোককে জটলা পাকিয়ে কি যেন বলাবলি করতে দেখেছিলাম। অন্ধকার হওয়ার পর মাত্র দু'তিনজন লোককে চলাফেরা করতে দেখেছি।

থালা বাটি নিয়ে বুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরই কুয়োতলায় ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ওর চিৎকার শুনলাম—'ওরে বাবারে গেছি রে, কোন ড্যাকরা শানের ওপর সাবান দিয়ে কাপড় ধুয়েছে রে—।'

চ্যাঁচানো শুনে বুঝলাম বুড়ি আছাড় খেয়েছে। এ বাড়িতে ঢোকার পর প্রথম হাসলাম। টুনি বললো, 'ডাইনিটার উচিৎ সাজা হয়েছে।'

বুড়ির চ্যাঁচানো শুনে হারিকেন হাতে দু'জন লোক বেরিয়ে এলো— 'তুমি কি গো মাসি, কুয়োতলায় আসবে, আলো দেখাতে বলবে না! হাড়গোড় ভাঙে নি তো?'

'হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।' নাকি কান্না কাঁদতে লাগলো বুড়ি—আমার মাজা ভেঙে গেছে রে—ও ড্যাকরার পোরা, জ্ঞান না দিয়ে আমাকে টেনে তোল না রে— ই-হিঁ-হিঁ-হিঁ—।'

একজন বুড়িকে তুলে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলো। আলো হাতে আরেকজন গেলো ওর পেছনে। আরো কিছুক্ষণ সময় কাটলো। ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো, তখন শুরু হলো আমাদের পরিকল্পনা মতো টুনির কান্না। ললি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো—এই দরজা খোল জলদি।

'কি হলো, ঘুমের সময় এতো চ্যাঁচামেচি কিসের?' বলতে বলতে দরজা খুললো পাহারাদার।

টুনি সমানে কেঁদে চলেছে। ললি ছিলো সামনে। বললো, 'ওকে সাপে কামড়েছে।'

লাঠি হাতে পাহারাওয়ালা ভেতরে ঢুকলো। টুনির গায়ে টর্চের আলো ফেলে বললো, 'কই—'

মাটির কলসিটা হাতে নিয়ে আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। লোকটার কথা শেষ না হতেই ঠকাস করে ওটা ওর মাথায় ভাঙলাম। আঁক'করে শব্দ বেরুলো লোকটার গলা দিয়ে। টর্চটা ফেলে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লো। বাবু শক্ত বালিশটা দিয়ে দমাদম তিন চার ঘা মাথায় বসাতেই লোকটা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

ব্যস্ত হাতে টর্চটা নিয়ে আমি চাপা গলায় বললাম, 'চলো।'

আমাকে টর্চ নিতে দেখে লোকটার লাঠি কুড়িয়ে হাতে নিলো বাবু। তারপর ললি টুনির হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

দুবার ওঠানামা করাতে সিঁড়ি কোথায়, বাইরে যাওয়ার দরজা কোথায় সব কিছু আগেই জানা হয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকারে পা টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। পাকড়াশীর ঘরে সকালে

ইলেকট্রিক লাইট দেখেছিলাম। দুপুরে শব্দ শুনে টের পেয়েছিলাম কোথাও ডায়নামো আছে। নামার সময় সিঁড়ির নিচে শুধু একটা হারিকেন জ্বলতে দেখলাম।

বাইরের দরজার পাশে হেঁড়ে গলায় একজন গান ধরলো— 'সোনা বন্ধুরে, কোন দোষেতে যাইবা ছাড়িয়া-আ-।'

ভাগ্যিস গান গেয়েছিলো! আমরা সেদিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। লোকটার সঙ্গে আরো লোকজন থাকতে পারে। সকালে দেখেছিলাম নিচের তলার বেশির ভাগ ঘরের দরজা জানালা নেই। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে পাশের ঘরে চলে এলাম। এ ঘরটার কোনো জানালা ছিলো না। উল্টো দিকের দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকতেই গরাদ ছাড়া একটা জানালা পেয়ে আমরা চারজন সেই জানালা দিয়ে টপাটপ বাইরে চলে এলাম।

বাইরেও অন্ধকার, তবে ঘরের মতো নিকষ কালো নয়। আকাশের তারার আলোয় অন্ধকার কিছুটা ফ্যাকাসে ছিলো। আমি আর বাবু ললি টুনির হাত ধরে দ্রুত পশ্চিমের দিকে এগুলাম। বিকেলেই ঠিক করেছিলাম আমরা পশ্চিমেই যাবো।

চারপাশে ঘন জঙ্গল আর অন্ধকার। দিক ভুল হলে আমরা পুব দিকে বর্ডার পেরিয়ে ইণ্ডিয়া চলে যেতে পারি। তাই আমরা শব্দ না করে জোরে পা চালালাম পশ্চিমের দিকে। একটু পরেই শুনলাম থ্যাবড়ামুখোর ফ্যাশ ফেশে গলার চিল চিৎকার—। 'পালিয়েছে রে পালিয়েছে, কে কোথায় আছিস শিগগির আয়! কত্তা সব কটাকে শুলে চড়াবেন।'

এবার আর পা টিপে হাঁটা নয়, সোজা দৌড় দিলাম জঙ্গলের দিকে। খানিক পরেই পেছনে পাকড়াশীর লোকজনদের হাঁকডাক শুনলাম—'তোরা উত্তর দিকে যা, আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে জান নিকলে দিবি। কত্তার কড়া হুকুম, জ্যান্ত যেন পালাতে না পারে।'

পাঁচ মিনিটও দৌড়াই নি, ললি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আবির, আমি আর দৌড়াতে পারবো না, দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

ললির কথা শুনে বাবু টুনিও দাঁড়িয়ে পড়লো। চাপা গলায় বললাম, ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়ানো যাক। আমাদের পায়ের শব্দ না পেলে ওরাও কনফিউজড হবে।'

মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরই ওদের পায়ের আওয়াজ পেলাম। তিন চারজন লোক ঠিক আমাদের দিকেই আসছে। ওদের শব্দ শোনার অর্থ হচ্ছে, আমরা হাঁটতে গেলে আমাদের পায়ের শব্দও ওরা শুনতে পাবে। অন্ধকারে জমাট পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমাদের কিছুই করার ছিলো না। টের পেলাম পৌষের শীতের রাতেও রীতি-মতো ঘামতে শুরু করেছি।

পায়ের শব্দ আরো কাছে এলো। একজনের গলা শুনলাম—'যেতে হলে তো এদিক দিয়েই যাবে, যদি না পথ ভুল করে।' ঠিক তখনই পশ্চিম দিক থেকে একটা শেয়াল না ভাম দৌড়ে আমাদের পাশ দিয়ে পুব দিকে চলে গেলো। শুকনো পাতার ওপর খচমচ শব্দ হাতেই একটা লোক—'এইতো এদিকে যাচ্ছে' বলে ব্যস্ত পায়ে পুব দিকে ছুটলো। ওর পেছন পেছন অন্য সবাই ছুটলো সেদিকে। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিসফিস করে ললিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাঁটতে পারবে এবার?'

ললির হাত তখনও আমার হাতে ধরা। বললো, 'পারবো।'

যতো কম শব্দ করা যায় পা টিপে টিপে আমরা সোজা পশ্চিম দিকে হাঁটলাম। পোড়ো বাড়িতে চোখ বেঁধে আনার সময় আমাদের কয়েক দফা অকারণেই ঘুরিয়েছিলো বলে মনে

হয়েছে। হাঁটছি বটে সোজা, তবু জঙ্গল তো! তার ওপর অন্ধকার। ভয় হচ্ছিলো ঘুরে ফিরে শেষে পাকড়াশীর ডেরায় গিয়ে না হাজির হই।

হাঁটতে হাঁটতে পা রীতিমতো ব্যথা হয়ে গেলো, জঙ্গল আর ফুরোয় না। তখন পর্যন্ত লাল পাহাড়ের ধুপ-ধুপ শব্দ শুনতে পাই নি। ওটা ছিলো আমাদের প্রথম লক্ষ্য। বিকেলে যখন পালাবার রুট নিয়ে প্ল্যান করছিলাম তখন বলেছিলাম লাল পাহাড়ে কোনোরকমে পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা নেই।

প্রথম দিকে মুক্তির আনন্দে সবাই উত্তেজিত থাকলেও শেষের দিকে একটা অনিশ্চিত ভয় বুকের ওপর চেপে বসতে লাগলো। আমরা কি আদৌ বাংলাদেশে আছি—একবার একথাও মনে হলো। ওরা শুনলে ভয় পাবে বলে কোনো কথা না বলে এক নাগড়ে হেঁটে চললাম।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর বেশ দূরে একটা শব্দ শুনলাম। মুহূর্তের জন্য চারজন দাঁড়িয়ে পড়লাম। উত্তেজনায় ধক্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। চিৎকার করে বললাম, 'স্ক্যাটরা। ' তারপরই শব্দ লক্ষ করে সামনের দিকে দৌড় দিলাম।

এদিকে গাছপালা আর আগের মতো ঘন নয়। দৌড়াতে দৌড়াতে বাবুও ডাকলো—'স্ক্যাটরা।'

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ।' স্ক্যাটরা আমাদের ডাক শুনতে পেয়েছে। ললি ক্লান্ত গলায় বললো, 'আস্তে আবির, আমি আর পারছি না।'

আমরা দাঁড়ালাম। একটু পরেই 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে ডাকতে ছুটে এলো স্ক্যাটরা। লাফিয়ে উঠে সবার গাল-টাল চেটে, ভেজা নাক ঘষে, একাকার করে দিলো। স্ক্যাটরার পেছনেই গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখলাম, আমাদের দিকেই আসছে।

জীপে জাহেদ মামা আর নেলী খালার সঙ্গে চারজন রাইফেলধারী জওয়ানও ছিলো। জীপ থামতেই নেলী খালা ছুটে এলেন—'কোথায় ছিলি তোরা? কেউ কি তোদের আটকে রেখেছিলো? সারাদিন আমি ভয়ে মরি—' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন নেলী খালা।

জাহেদ মামা বললেন, 'নেলী, আগে ওদের ঘরে নিয়ে চলো। সব শুনতে হবে। মনে হচ্ছে এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'জাহেদ মামা, আপনার ফোর্স এখানে থাকুক। আরো দরকার হবে। পাকড়াশীর বিরাট দল। চলুন যেতে যেতে বলছি।'

জওয়ানরা জীপ থেকে নেমে গেলো। আমরা সবাই উঠে বসতেই জাহেদ মামা পুরো স্পিডে বাংলোর পথে জীপ চালালেন। সকাল থেকে সারাদিন যা দেখেছি আর যা ঘটেছে সব খুলে বললাম।

আমাদের বাংলোতে নামিয়ে দিয়েই জাহেদ মামা জীপ নিয়ে ছুটলেন। বাংলোতে ঢোকার সময় লক্ষ করলাম গেটের পাশে দুজন রাইফেলধারী সৈন্য।

নানু বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'আগে খেয়ে দেয়ে সুস্থির হও, তারপর সব শুনবো।'

পরদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙলো অনেক দেরিতে। নেলী খালা ইচ্ছে করেই পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছিলেন। নাশতার টেবিলে নেলী খালা বললেন, 'পাকড়াশী আর কিশোর পারেখ দুজনই বর্ডার ক্রস করে পালিয়েছে। পাকড়াশীর দলের ষোলজন ধরা পড়েছে। এর ভেতর একটা বুড়িও আছে।'

আসল শয়তান দুটো পালিয়ে গেছে শুনে মন খারাপ হয়ে গেলো। টুনি বললো, 'ওই বুড়িটা ভীষণ পাজি নেলী খালা। বলে কিনা আমাদের বটি দিয়ে কাটবে।'

বাবু বললো, 'মনিদা কিশোর পারেখের কোনো খবর দিতে পারলো না?'

'কাল রাত থেকে তিনিও জাহেদের সঙ্গে। সারারাত ওরা কেউ ঘুমোয় নি।'

নানু মৃদু হাসলেন , 'যেন তুমি কতো ঘুমিয়েছো নেলী!'

নেলী খালা বললেন, 'বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি প্রফেসরের দল আর মুনীর সাহেবকে। ওরা সবাই তোমাদের কাছে শুনতে চাইছে কি ঘটেছিলো।'

শুনে খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। ম্যাপটা উদ্ধার করা গেলো না, কালপ্রিটরাও ধরা পড়ে নি। আমাদের আর বাহাদুরি রইলো কোথায়!

বিকেলে সবার আগে এলেন প্রফেসর, তাঁর সঙ্গে জনা চারেক তরুণ জিওলজিস্ট। মনিদা এলেন ওর এক চাচাকে নিয়ে। আজই নাকি এসেছেন মনিদার ওখানে বেড়াতে। আর্মি ক্যাম্প থেকে এসেছে দুজন তরুণ অফিসার। জাহেদ মামা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিশোর পারেখকে। একজন ক্যাপ্টেন বললো, 'স্যারের ধারণা ও ইণ্ডিয়া যেতে পারে না।'

পুরো ঘটনাটা আমাকেই বলতে হলো। শেষে বললাম, 'আসল কাজের কিছুই করা যায় নি। আমরা স্যারের ম্যাপটা খুঁজে পাই নি। যে শয়তান আমাদের আটকে রেখেছিলো তাকে ধরতে পারি নি।'

প্রফেসর আমার কথা শুনে হা হা করে হাসলেন—'ম্যাপ কোত্থেকে পাবে? ওটা সত্যি সত্যি চুরি গেলে তো!'

'তবে যে সেদিন বললেন—' বিস্ময়ে আমাদের চোখ ছানাবড়া!

'মিথ্যে বলি নি। চুরি হতে পারে আমি ধরেই নিয়েছিলাম। তাই অরিজিন্যাল ম্যাপের দুটো কপি করেছিলাম। ওরই একটা কিশোর পারেখ চুরি করেছে। তবে কপিতে আমি কিছু রদবদল করেছি, যেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না। সেদিন ম্যাপ চুরি নিয়ে তুলকালাম না করলে কিশোর পারেখের মতো বুদ্ধিমান চোর ঠিকই ধরে ফেলতো আমার চালাকি। হা-হা-হা—' প্রাণ খুলে হাসলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'তোমাদের লাল পাহাড়ের হার্টবিটের রহস্য ভেদ করেছি। ওটা গ্যাসের একটা সার্টেন প্রেশারের জন্য হয়। শব্দটা হয় শীত পড়লে , গরমকালে এলে শুনতে পাবে না।'

মনিদা বললেন, 'কিশোরের যে এতোটা অধঃপতন হয়েছে আমি ভাবতেই পারি নি। আবিরদের মতো ওর ছবি বানানোর গপ্পোটা আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম। আজ সকালে ওর ব্যাগ ঘাটতে গিয়ে পাকিস্তানী আর লিবিয়ান পাসপোর্ট পেয়েছি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

বাবু বললো, 'আবির আগেই সন্দ করেছিলো ও পাকিস্তানী এজেন্ট।'

নুলিয়াছড়ির এ্যাডভেঞ্চার নিয়ে ছবি করা হলো না বলে টুনির মন খারাপ। বললো, 'শয়তানটাকে যদি জাহেদ মামা একবার ধরতে পারে মজা দেখাবো।'

নেলী খালা বললেন, 'শয়তান পাকড়াশীকে আমরা কেউ চিনতে পারি নি, অথচ স্ক্যাটরা ঠিকই চিনেছিলো। নইলে রাস্তার অচেনা লোক দেখলে কখনও ও ঘেউ ঘেউ করে না।'

স্ক্যাটরা ওর নাম শুনেই নেলী খালার কাছে এসে আদরের জন্য গলা বাড়িয়ে দিলো। আমি বললাম, 'পাকড়াশী একমাত্র স্ক্যাটরাকেই ভয় পায়।' জাহেদ মামা সম্পর্কে ও কি মন্তব্য করেছে সেটা আর সবার সামনে বললাম না।

চা খেতে খেতে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছিলো। মনিদার চাচা একফাঁকে আমাকে বললেন, 'তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে একটু দেখিয়ে দেবে?'

ওঁকে নিয়ে আমি আমাদের ঘরে এলাম। বাথরুমের দরজা খুলে বলতে যাবো 'এই বাথরুম,' ঠিক তখনই পেছনে পরিচিত গলা শুনলাম— চিনতে পারিস নি তো? এবার শুধু চেহারা নয়, গলার স্বরও বদলেছি।'

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি মনিদার চাচার ছদ্মবেশে ভাইয়া দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এসে ভাইয়া আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো— 'তুই কতো লম্বা হয়ে গেছিস আবির! দেখতে সুন্দর হয়েছিস!'

আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, 'মনিদাকে তুমি চেনো কি করে?'

'মনি স্কুলে আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তো। ম্যাট্রিক পাশ করে ও লণ্ডন গিয়েছিলো টী টেকনলজি পড়তে! আট বছর পর দেখা!'

'নেলী খালার সঙ্গে কথা বলেছো? তোমাদের জন্য গরম কাপড় জোগাড় করে রেখেছেন।'

'কাল তোরা যখন বেড়াতে যাবি তখন এসে কথা বলবো।'

'তুমি কদিন থাকবে তো ভাইয়া? আমি আমার স্কলারশিপের জমানো সব টাকা নিয়ে এসেছি তোমাকে দেবো বলে! নেলী খালার মতো প্রতি মাসে তোমাকে টাকা পাঠাবো ভাইয়া।' ভাইয়ার মুখে মৃদু হাসি। যদিও বয়স্ক মানুষের মেকাপ নিয়েছে, তবু মনে হলো অনেক শুকিয়ে গেছে ভাইয়া। বললো, 'মনির ওখানে দিন চারেক থাকবো। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। এর ভেতর সময় করে নেবো। চল এবার যাই। তোর বন্ধুরা আবার চলে আসতে পারে।'

বাইরে তখন অন্ধকার নেমেছে। বাবু টুনি দূরে লনে বসে কথা বলছে। বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে ললি একা দাঁড়িয়েছিলো।

ভাইয়া লনে গিয়ে মনিদার সঙ্গে বসলো। আমি ললিকে বললাম, 'আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন ললি।'

'জানি আবির।' আস্তে আস্তে ললি বললো, 'আমি তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি।' একটু থেমে ললি আবার বললো, 'তুমি আমাকে খারাপ ভাবছো না তো আবির?'

'ছিঃ ললি! ওকথা কেন বলছো? তোমার মতো বন্ধুকে কখনো খারাপ ভাবা যায়!'

'বাবার কথা মনে হচ্ছে আবির!' ললির গলা ভারি শোনালো। আমি ললির হাতের ওপর হাত রাখালাম। ওকে বোঝাতে চাইলাম আমি আছি ওর পাশে।

'অপু ভাইয়ার মতো হঠাৎ যদি কখনও বাবার দেখা পেতাম।'

আমার বুকের ভেতর ললির জন্য গভীর দুঃখ আর মমতা অনুভব করলাম। বললাম, 'বাবার জন্য গর্ব হয় না ললি?'

আবছা আলোতে দেখলাম ললির চোখে পানি। আমার কথা শুনে ওর ঠোঁটের ফাঁকে গর্বের হাসি ফুটে উঠলো। ফিসফিস করে বললো, 'হয় আবির।' একটু থেমে আবার বললো, 'অপু ভাইয়ার সঙ্গে তোমার কথা শুনেছি। তোমার জন্যেও গর্ব হচ্ছে।'